"ফিরে আসা বন্ধনে"

অপর্না ভ্যালেন্তিনা গমেজ, বারমুদা

"নীরবে কাঁদে সুষমার মৌন আঁখি। কেউ জানেনা কি দুর্বিসহ সংগ্রাম তার কোমল ভালবাসার সাথে। বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই তার কামনার পুরুষটির মনে।" গল্পের ডায়ালগে ডুবে গেছে রিয়ার মন। দরজায় টোকা মারতেই সহসা চমকে উঠে। তড়িঘড়ি বইটি লুকিয়ে রাখে বালিশের নীচে।

-এত রাত অব্দি কি পড়ছিস? ঘুমোবি কখন? রাত কটা বেজেছে সেদিকে খেয়াল আছে?

ঃ এই তো মা আর একটু। তুমি শুয়ে পড়। কাল একটা টেস্ট আছে কিনা।

-আমি জানি বরাবরই তুই ভাল রেজাল্ট করছিস। তাই তোর উপর আমার ভরসা আছে। তবে এত রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে।

ঃ মা আমি তো এখন আর সেই ছোট্ট রিয়া নই, আমি এখন বড় হয়েছি। ঘুম পেলেই শুয়ে পরব, তুমি যাও।

- ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। গ্লাসের দুধ মনে করে খেয়ে নিস।

ঃ ওকে, মা তুমি যাওতো। ইস - বাঁচা গেল, আর একটু হলেই ধরা খেতাম।

রিয়া আবার পড়তে থাকে। প্রেমের উপন্যাস এমনি মনে ধরেছে যে প্রতিরাতেই তার তন্দ্রা উড়ে যায়। কখন যে রাত ২/৩ টা বেজে যায় সেদিকে তার খেয়ালই থাকেনা। ওদিকে মা ভাবছে মেয়ে কতইনা মনোযোগী। এভাবে দিন যেতে থাকে রিয়া ধীরে ধীরে বেশ আকৃষ্ট হয়ে পরে উপন্যাসের প্রেমিক ধ্রুবর প্রতি। রাতের পর রাত বইয়ের পাতায় দৃষ্টি মেলে রাখে। মাঝে মাঝে তার মনে হয় বাস্তবতার সাথে কোথাও এর কোন মিল আছে। লেখকের মনে ঘটনার দৃষ্টান্ত থেকেই এমন জীবন্ত লেখার জন্ম হয়েছে। রিয়ার চিন্তা ভাবনায় কিছু কল্পনা, কিছু বাস্তবতা, কিছু স্বপ্নের প্রতিচ্ছবির ছিটেফোঁটা রঙের আঁচড় কাটতে থাকে। পড়াশুনার দিকে প্রায়ই সে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। ইদানীং কিছুতেই তার মন স্থির থাকেনা।

রেজাল্ট হাতে পেয়ে রিয়া মাকে দেখানোর সাহস পায়না। কিন্তু মায়ের হাতের সিগনেচার ছাড়া এটা জমাও দেয়া যাবেনা। চট করে তার মাথায় বুদ্ধি খ্যালে মায়ের সিগনেচার নকল করার। এমন দুঃসাহসী কাজটি তার দ্বারা সম্ভব হয়ে যায়। যে রিয়া মাকে সব কথা বলে সে কিনা দিন দিন নিজের ভেতরে গুটিয়ে যেতে থাকে। সবকিছু তার কাছে কেমন যেন পুরাতন হতে থাকে, নিরানন্দ মনে হতে থাকে। নতুন কিছু ভাল লাগা থেকেই এমন কাউকে তার ভাল লাগতে থাকে যাকে সে সব সময় দেখতে চায়, তার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে। এভাবেই তার ক্লাশ মেট অনয়ের প্রতি সে দুর্বল হয়ে পড়ে, কেমন যেন ভাল অনুভব করে। অনয় ছেলে হিসেবে খুবই টেলেন্ট এবং তারা এক সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বীও। বর্তমানে অনয়ের রেজাল্ট রিয়ার চেয়ে ভাল। কিন্তু রিয়ার প্রতি অনয়ের শুধুই বন্ধু সুলভ দৃষ্টি এর বাইরে কিছু নয়। তাছাড়া উভয়েই পরস্পর সমবয়সী। কিন্তু ১৬ বছরের রিয়ার মত একটি মেয়ের মনে যখন দ্রুতগামী ট্রেনের মতই জীবনের বাস্তবতা তার মনকে ঝাঁকিয়ে তোলে তখন সে আর নিজের পথে একা দাঁড়াতে সাহস পায়না। যে মা তার সার্বক্ষনিক দৃষ্টির ছায়ায় তার মনের সব ইশারা এক সময় বুঝতেন সেই মায়ের স্নেহের আড়ালে সে এখন অন্য কিছুর সন্ধান করছে। কিন্তু সন্তানের আচরণ মায়ের দৃষ্টি ঠিকই প্রত্যক্ষ করেছে। কেন রিয়া হামেশা দরজা বন্ধ করে স্টাডি করে, একা একা থাকতে পছন্দ করে। ব্যস্ত থাকে নিজের মধ্যে। বান্ধবীদের সাথে ফোনে কথা বলার সময় এদিক সেদিক তাকিতুকি করে। তার ব্যক্তিগত ড্রয়ারে আজকাল লক থাকে। কেমন যেন গোপন করার প্রবনতা দিন দিন রিয়ার চাল চলনে প্রকাশ পাচ্ছে। শত ভাবনার ভীড়ে মায়ের মনে ঠিকই হাজারো প্রশ্নের ঝড় ওঠে। তাই রিয়ার প্রতি তার সার্বক্ষনিক দৃষ্টি বাইনেকোলারের মত তাকে অনুসরণ করতে থাকে। হঠাৎ একদিন বিছানাপত্র গোছাতে গিয়ে চোখে পরে একটি বই, শিরোনাম দেখে বোঝা যায় কাহিনী প্রেমসংক্রান্ত। বইটি হাতে নিয়ে কয়েকটি পাতা উল্টে পাল্টে দেখলেন। কিছু কিছু লাইন মার্ককরা। ডায়ালগগুলো খুবই মিনিংফুল। বইয়ের সেল্‌ফে ভাজে ভাজে বেশ কিছু গল্পের বই খুব কায়দা করে সাজিয়েছে রিয়া। রিয়ার ঘরে ফেরার সময় হয়েছে, মা সবকিছু গোছগাছ করে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে রিয়া ঘরে ঢোকে। ব্যাগটি বিছানায় ফেলে কিছুক্ষন দাঁড়ায় আয়নার সামনে, কপালে দু'একটি ব্রোন উঠেছে সেগুলো খুঁটিয়ে দেখছে। রুমের সবকিছু গোছানো, বালিশের নীচে বইটিও ঠিকমতই আছে হয়তোবা মা দেখেনি। দরজা বন্ধ করে কাপড় পাল্টানোর সময় মা দরজায় নক করে।

- রিয়া একটু শুনে যাস তো।

ঃ আসছি মা। লা-লা-লা-হু-হুম-হু।

- তো যে টেস্ট হল গত মাসে তার রেজাল্ট এখনো দেয়নি?

ঃ হ্যা দিয়েছে তো, কেন তোমাকে দেখাইনি? তুমি বোধহয় ভুলে গেছ মা, তোমার সিগনেচার নিয়ে ওটা তো জমা দিয়েছি।

- আমি এতটা বেভুলো হইনি রিয়া। তোর টিচার আমাকে গতকাল ফোন করেছিল। তোর রেজাল্ট কেন এতটা খারাপ হয়েছে তা জানার জন্য। আমি কোন জবাব দিতে পারিনি। আমি এতটাই অবাক হয়েছি যে কোথা থেকে কি হচ্ছে! যাক গে তবে আমি বুঝতে পারছি যে তুই কিছু গোপন করার চেষ্টা করছিস। তোর মন-মানসিকতার পরিবর্তন আমার দৃষ্টি এড়াতে পারেনা। এত রাত জেগে জেগে তুই কি পড়িস সেটাও আমি জানি।

ঃ মা গল্প বই পড়া কি খারাপ?

- আমি বলিনা খারাপ, তবে গল্পবই পড়ার নেশা খুব খারাপ। তোর এখন পুরোদমে পড়াশুনায় মনোযোগী হওয়া উচিত। তোর গত মাসের টেস্ট কি এতটাই খারাপ ছিল যে সেটা আমাকে দেখানোর সাহস পর্যন্ত হয়নি। আর আমার সিগনেচার নকল করার সাহস তোর হল কি করে? আমার পেটের সন্তান আজ আমারই সাথে চালাকি করছে।

কথাগুলো বলতে বলতে মা কেঁদে ফেলে। রিয়া দিশেহারা হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে।

ঃ মা, মা আমার ভুল হয়ে গেছে মা। এমন কাজ আর কোনদিন করবনা। এই তোমার হাত ধরে প্রমেজ করলাম।

- কথায় কথায় প্রমেজ করবিনা। যারা সহজে প্রমেজ করে খুব সহজেই তা ভাঙ্গেও।

তুই বড় হয়েছিস কিন্তু তাই বলে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার মত জ্ঞান তোর এখনো হয়নি। ইদানীং তুই অনেক কিছু লুকোবার চেষ্টা করিস। কি হয়েছে এমন যা আমাকে বলতে পারছিসনা? আমি শুধু তোর মা নই তোর বন্ধুর মতও। তোর কষ্ট আমার চেয়ে অন্য কেউ বুঝবেনা।

ঃ কই কিছু হয়নি তো। আমি তো একই রকম আছি। আসলে তুমি আমাকে নিয়ে অনেক বেশী দুঃশ্চিন্তা কর সেজন্য এমনটি মনে হচ্ছে তোমার।

- তোর কোন চাওয়া আমি অপূর্ণ রাখিনি। প্রয়োজনের চেয়ে বেশী-ই সব সময়ে দিয়েছি। কিন্তু তোর হঠাৎ লেখাপড়ার এমন অবনতি আমি মানতে পারছিনা।

ঃ মা বলছিতো আমার কিছু হয়নি, কেন বুঝতে পারছনা?

- তবে কি আমি শুধু শুধু এমন করছি?

রিয়া কিছুটা বিরক্তবোধ করে মার কথা শেষ না হতেই চলে যায়। প্রচন্ড রাগে মার মন তেজে উঠে তবে নিজেকে সংযত করে নেয়। একদিন মা হয়ে সন্তানের সব কথা, সব ব্যথা বুঝতে পেরেছেন অথচ আজ সন্তানকে বুঝতে এতখানি কষ্ট হচ্ছে তার। তবে এ কি তার ব্যর্থতা? মায়ের অস্থির মনে হাজারো প্রশ্নের ঝড় উঠতে থাকে। যখন রিয়া ছোট ছিল, অবুঝ ছিল তখন মা তার সব ইশারা বুঝতেন আর আজ তিনি সন্তানের মনের গভীরে কি আছে তা বুঝতে পারছেননা। অবাক বিস্ময়ে উদাস হয়ে পরেন মা, সন্তান বড় হচ্ছে তাই কি ধীরে ধীরে তার হৃদয়ের দূরত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরছে মায়ের স্নেহের ছায়া। বিকেলে রিয়া পড়ার টেবিলে বসলে সেই ফাঁকে মা ছুটে যায় অদিতির কাছে। অদিতি রিয়ার ছোট মাসী। মাসী-ভাগ্নীতে ভীষন অন্তরঙ্গ, অনেকটা বান্ধবীর মত। হয়তবা অদিতি কিছুটা সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু রিয়া খুবই চালাক অদিতির কাছেও সে মুখ খোলেনা। আসলে রিয়ার সাথে অনয়ের সম্পর্ক তেমন কিছুই নয়, শুধুই বন্ধুত্ব। অনয়ের দৃষ্টিতে রিয়া একজন ভাল বন্ধু কিন্তু রিয়া এটাকে অন্যভাবে গ্রহন করেছে। কল্পনার রং দিয়ে অলীক স্বপ্নের মন্দির গড়েছে। সম্ভব-অসম্ভবের কথা সে কখনো ভাবেনি। এক সময় যখন অনয়ের কাছ থেকে তেমন কোন সারা পাচ্ছিলনা তখন থেকে রিয়া নিজের ভেতরে জেদী হতে থাকে। না পারে সে মাকে বলতে, না পারে এর মোকাবিলা করতে। দোটানা পরিস্থিতির মধ্যে রিয়া দিন দিন হাবুডুবু খেতে থাকে। মাও চুপচাপ বসে নেই, তিনি অনেক ভেবে চিন্তে অবশেষে ছুটে যান রিয়ার বান্ধবী তনিমার কাছে। মায়ের অস্থিরতা দেখে প্রথমে তনিমা কিছুটা ঘাবড়ে যায়। কেননা রিয়ার ব্যাপারে সে যতটুকু জানে সেটা বলতে গেলে রিয়ার সাথে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। বিচলিত মায়ের দৃষ্টিতে তনিমার মনে অভয় আসে। তনিমা রিয়ার কাছে বিষয়টি গোপন রাখার কথা দিলে ও মায়ের ব্যাকুলতা দেখে তা ভেঙ্গে দেয়। তনিমার কাছ থেকে বিষয়টি জেনে মা কিছুটা স্বস্তি বোধ করেন। খুব ঠান্ডা মেজাজে পরদিন রিয়ার সাথে খোলাখুলি আলাপ করতে বসেন। রিয়ার পাশে বসে হাত দুটো নিজের তালুতে রেখে সন্তানের চোখে চোখ রাখেন।

- আমি সব জেনেছি।

ঃ কি জেনেছ তুমি?

- আমার রিয়ামা এত বড় হল কবে যে তার মনের কথা আমি বুঝতে পারব না?

মায়ের গলা জড়িয়ে রিয়া কেঁদে ওঠে। সে অনেক কথা বলতে চায় কিন্তু কোন কথা দিয়ে আরম্ভ করবে তা বুঝে উঠতে পারেনা। লজ্জায় নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

- আসলে এটা তোর দোষ নয়, দোষ বয়সের। এই বয়সের জোয়ারে টিকতে হলে পিতামাতার স্নেহের ছায়ার বড় প্রয়োজন। মাথার উপর তাদের ছায়া থাকলে

কোনদিন সন্তান ভুল পথ অনুসরণ করতে পারেনা। আমি জানি তোর এই মুহূর্তে হয়তবা তনিমার উপরে রাগ হচ্ছে ভীষন কারন সে তোর প্রমেজ ভেঙ্গেছে। কিন্তু এটা হয়ত তুই জানিসনা প্রমেজ ভাঙ্গলেও তোর জীবনের নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে।

ঃ সেটা কেমন করে?

- রিয়া, তোর আবেগের দৃষ্টিতে সবকিছু রঙিন লাগছে এখন তাই তোর বিবেকের দৃষ্টিতে তালা পরেছে। ভাল মন্দ বিবেচনার শক্তি কাজ করছেনা এখানেই তো ভয়। যা দেখছিস সবই ভাল লাগছে, হাতের কাছে সবই কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু জীবনটা এত সহজ নয়রে মা, এতটা সরলও নয়। তাই ভেবে চিন্তে পা ফেলতে হয়। এই ভাল লাগা থেকে যা কিছু গ্রহন করবি তা একটু বুঝে নিলে জীবনের জন্য ভাল হবে আর যদি এই ভাল লাগার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলিস তবে তলিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবেনা। জীবনটা হচ্ছে একটা সাগরের মত এতে যখন ঝড় ওঠে তখন হাল শক্ত করে ধরতে হয়। আমি বলছিনা ভালবাসা কোন অপরাধ তবে নির্দিষ্ট বয়সের আগে সেটা বিপদপূর্ণ বটে। অনেকে আবেগের বশে নিজেকে সামলাতে পারেনা। সবকিছু খুব সহজ মনে হয়, জীবনটাকে স্বর্গ বলে মনে হয়। কচি মনে আঘাত লাগলে জীবনটা বিষাদে ভরে যায়। এই সময়টা খুবই কঠিন সময় হয়ে দাঁড়ায়।

ঃ মা আমাকে ক্ষমা কর, তোমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। তুমি এভাবে না বললে হয়ত বুঝতেই পারতামনা। আমার মাথায় হাত রেখে বল আমাকে ক্ষমা করেছ।

- পাগলী মেয়ে নিজে থেকে যে আজ বুঝতে পেরেছ সেটাই তোমার জীবনের জন্য মঙ্গল।

রিয়ার সাথে মায়ের বন্ধুসুলভ আচরণ গভীর ছিল বলেই সন্তানের অকস্মাৎ পরিবর্তন মার দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি। রিয়া একজনকে ভালবেসেছে কিংবা ভাল লেগেছে এটা তার অপরাধ বা ভুল নয় কিন্তু তার অতটুকু বয়সে হোঁচট খেলে তা সামলাবার মত শক্তি-ই যদি না থাকে তাহলে পিছলে যাবার ভয় আছে। সেই অনুভূতি হয়ত একসময় তাকে জীবনের চরম দুর্দশার পথে উপনীত করবে। কোমল মনে ভালবাসার প্রথম আঘাত অনেকেই সইতে পারেনা। যৌবন এমন একটা বয়স যখন অকাতরে যে কোন কিছুর মূল্যে জীবন বাজি রাখার সাহস যোগায়। হতে পারে সেটা ভালবাসার মানুষের জন্যে, হতে পারে তা দেশ প্রেমের জন্য। তবে যা কিছুর জন্যই হোক সেটা অবশ্যই ভালবাসার গভীরতার জন্য।

তোমাকে

জিতা গোমেজ, জার্সি সিটি, নিউজার্সি

লোপা,

কেমন আছো তুমি? অনেক দনি পরে তোমায় লিখছি। না, সত্যি বলা হলো না। প্রায়ই লিখি। মন খারাপ থাকলেই বেশী লেখা হয়। মনে মনে চিঠি লেখার এই উপায়টা তোমার কাছেই শেখা। বলেছিলে telepathy-র জোর তীব্র হলে নাকি ক্ষনিকেই পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। জানিনা এই চিঠি কখন গিয়ে তোমার মনের দরজায় পৌঁছবে।

আচ্ছা? তুমি কি জানো যে তুমি কিন্তু আমার কত প্রিয় একজন মানুষ? তোমায় দেখেছিলাম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির পরপর, মনে আছে তোমার ? সহপাঠি হলেও আলাপের শুরুটা হয়েছে অনেক দেরিতে? তুমি কিন্তু ক্লাসে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক থাকতে। কেন বলতো? তোমায় দেখে মনে হতো যেন ছায়া, কোন জায়গাতে থেকেও নেই। মনে হতো কায়া বর্তমানে আর মনটা ঘুরে ফিরছে অন্য কোথাও, অন্য কোন খানে। আর কারো চোখে তুমি হয়তো খুব সাধারন লাজুক একটা মেয়ে। হয়তো অনেকের চোখেও পড়ো না। কিন্তু আমার যে কি হলো, তোমায় ভাল লেগে গেল আর আমার পুরো জগতটাই তুমি হয়ে গেলে।

আমি বরাবরি মেধাবি ছাত্র ছিলাম, শিক্ষকরাও বেশ সমীহ আর স্নেহের চোখে দেখতেন, তাইনা? বন্ধুর অভাব ছিল না আমার। তুমি বলতে আমি নাকি একনিষ্ঠ শ্রোতা আর খুব সাবলীল একজন মানুষ। সে কারনেই এত পরিচিতি। মানুষ খুব সহজেই আমায় কাছে টানে, আন্তরিক হয়ে যায়। আমর ভাল লাগে, কৃতজ্ঞ হই।

তুমি ছিলে একদম উল্টোটা, কেমন যেন অস্বস্তিতে গুটিয়ে থাকতে নিজের মাঝে। কারো সাথে মন খুলে মিশতে পারতে না, নিজেকে প্রকাশ করতে পারতে না।

কোন অজ্ঞাত কারণে আমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে, নিজেকে খোলসের থেকে মুক্তি দিয়ে ডানা মেলে প্রজাপতির মত। বলতে আমি নাকি তোমার একমাত্র বন্ধু। কিযে আনন্দ হতো আমার। গর্বে আমার পৃথিবী ঝলমল করে উঠতো।

তোমার সাথে যখন সংসদ ভবনে বেড়াতে বেরুতাম তখন নিজের অজান্তে প্রতিক্ষায় থাকতাম যে আজ নতুন কি হবে। কোন রূপে দেখবো তোমায়। কোন কোন দিন তুমি কথা বলে যেতে অনর্গল। ছেলে বেলার কথা কিম্বা সারাদিন কি ভাবে কাটলো। সবকিছু বলতে খুটিনাটি। কখনো কাপড়ে কাদা লাগা বা পিপড়ের ভয়ে অস্তির হয়ে ছুটফট করতে কিশোরীর মত। কখনো আবার খুব নির্লিপ্ত নিশ্চল হয়ে বলে থাকতে। যেন আশে পাশের পরিবেশের কিছুই তোমায় স্পর্শ করছে না, তুমি হারিয়ে গেছ অনেক অনেক দূরে।

আমার অবাক লাগতো, একই মানুষের কত রূপ। তোমার যেন কোন দলে ফেলা যায় না। তুমি কি শান্ত না চঞ্চল মেয়ে?

একদিন খুব সখ করে বাদাম কিনে, না খেয়ে কেমন হঠাৎ চুপ হয়ে গেলে। চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠলো যেন। অনেক প্রশ্নের পরে বল্লে বাদামওয়ালা ছোট্ট ছেলেটার জন্য তোমরা খুব মায়া লাগছিল। ভাবছিল, কে কে আছে ওর, কেমন করে টানা পরনে চলে ওদের সংসার?

এক এক দিন এক এক রূপে তুমি ধরা পরতে আমার চোখে। মনে মনে হাসতাম, ভাবতাম " এই মেয়েটাকে পুরোপুরি বুঝতে বুঝতে একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

আজকে বাড়ীর কথা খুব মনে পরছে। আমাদের আর্থিক অবস্থা ছিল মোটামুটি, মধ্যবিত্ত আর নিম্ন মধ্যবিত্তের গন্ডির আবর্তে। মাকে সংসার চালাতে হতো বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে।

বাবার অবসর নেবার পরে প্রধান কাজই হয়ে গেল যেন মায়ের দৈনন্দিন সাংসারিক কাজে অহেতুক তদারক করা। আমার বাবা কিন্তু মানুষ ভাল। অবসর নেবার পর বন্ধু বান্ধবহীন মানুষের জীবন যেমন গুটিয়ে আসে, ওনারটাও তাই।

মায়ের সাথে সংসারিক কাজগুলোতে লেগে থাকার কারন বোধহয় উনি জানেন এই একজন মানুষের উপর ওনার অধিকার, আবদার চলে। ব্যতিক্রম কিছু হলেই বরং মা ভাবেন," মানুষটার শরীর খারাপ করেনি তো?"

জানো আমার মায়ের বাইরের কোন জীবনই কখনো ছিলনা। চার দেয়ালের মাঝেই তার পৃথিবী। আমাদের দেশের অধিকাংশ মায়েদের মতই তার উদয়স্ত চিন্তা, রান্না, খাওয়া এবং সংসারিক কাজ। রবিঠাকুরের ভাষায় "এই জীবনটা ভাল কিম্বা মন্দ কিম্বা অন্যকিছু ভেবে দেখবো কখন আগুপিছু? অমি শুধু জানি রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা"

আমার ইচ্ছে করতো মাকে বলি "আজ তোমার ছুটি, তুমি সারাদিন ঘরের কোন কাজ করবে না, ঘুরে বেড়াও, ইচ্ছে মত দিনটা কাটাও। তুমি যে একজন মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, সংসারের বাইরেও যে তোমার অস্তিত্ব আছে তা নিজের অনুতে অনুতে উপলব্ধি করো। হাসো, খেলো, বাঁচার আনন্দে বাঁচো। তুমি মুক্ত, সম্পূর্ণ মুক্ত একজন মানুষ।" পর মুহূর্তে হেসে ফেলতাম। খাঁচার পাখীকে মুক্তি দিলেই বুঝি উড়তে পারে? সে যে ওড়াই শেখেনি।

উফ্, আবার বুঝি সঙ্গা হারাবো। অবশ ভাবটা গ্রাস করছে যেন। ও হ্যাঁ, তোমাকে তো বলাই হয়নি আমি এই মুহূর্তে কোথায়। আজকের তারিখটা সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সাল। আমি world trade center এর ৫০ তলার এক অফিসে breakfast ডেলিভারী দিতে এসে চাপা পড়ে আছি। সম্ভবত শরীরের বেশীর ভাগ অংশই থেতলে গেছে। কোন এক আশ্চর্য উপায়ে মাথাটা রক্ষা পেয়েছে। বার বার যন্ত্রনায় সংগা হারিয়ে, জেগে আমি এখন ক্লান্ত, শক্তিহীন, নিলিপ্ত অপেক্ষমান।

দেখেছো? কেমন সহজ ভাবে কথাগুলো বলে গেলাম? একটা রসিকতা করতে ইচ্ছে করছে। মনে আছে? একসময় তোমর হাত দেখার পড়াশুনার বাতিক হয়েছিল? একদিন তুমি আমার হাতের পাশে হাত রেখে বলেছিলে " আমাদের দু'জনার আয়ুরেখা কত লম্বা, আমরা একসাথে বুড়ো হতে পারবো।" আর আমার এখনকার অবস্থা দেখ, ভাঙ্গা চোরা গুড়িয়ে যাওয়া অস্তিত্ব, যেকোন সময় ইতিহাস হয়ে যাবো।

এই আমার এক দোষ, কষ্টের মাঝে হাসি পায়। মা খুব বিরক্ত হতেন। আর তুমি হতে অবাক।

এখানে আসার ক'বছর পরে যখন হঠাৎ একদিন শুনলাম তোমার অবস্থাপন্ন একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে সেদিনও খুব হেসেছিলাম। হাসতে হাসতে লক্ষ্য করলাম চোখদুটো ভেসে যাচ্ছে।

আচ্ছা সে কথায় পরে আসি। আমার এদেশে আসার কথা তোমার মনে আছে? ৪ বছর হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমার মেধা, শিক্ষার কোন মুল্যেই দিতে পারলোনা। বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে চোখের সামনে এক একটা স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিতে দেখলাম। আহাকার আত্মবিশ্বাস আর নীতিবোধ এর কারনে কখনো তদবীর করতে পারিনি। সে যে কি দুর্বিসহ জীবন ছিল, দিন দিন নিজের কাছে ছোট হয়ে যাওয়া। আমার গম্ভীর ধরনের ভাইটা হঠাৎ একটা ভাল চাকরী পেয়ে আরো গম্ভীর হয়ে গেল। না, অশ্রদ্ধা সে কখনো আমায় করেনি, তবে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে গেলো এবং ওর সাথে সাথে বাড়ীর বাকি সবাই।

ঠিক এমন একটা সময়তেই ছোট একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সুযোগ পেয়ে দেশ ছাড়লাম New York এর পথে। তুমি তখন ঢাকা বাইরে। দেখাও হলোনা। স্বপ্ন ছিল কাজ করে, পড়াশুনা করে প্রতিষ্ঠিত হবো। অনেকেই তো পেরেছে। তারা পেরে থাকলে আমি পারবো না কেনো? আপ্রাণ চেষ্টায় কিনা হয়?

সবকিছুর চেষ্টা একসাথে করলাম। হলো না, এতো ঘন্টা চাকরী করে পড়া হতো না। নিজের শরীরটা মনবলের সাথে প্রতিযোগীতায় হেরে গেল। মনটা ছটফট করতে করতে একসময় পরাজয় মেনে নিলো। টিকে থাকার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য শুরু হলো এক নতুন জীবন যুদ্ধ। ডিগ্রী না নিয়ে অথবা অর্থ সঞ্চয় না করে দেশে ফিরে যাওয়াটাও তো পরাজয়। আমি আর হারতে রাজি হলাম না। ছুটলাম সোনার হরিনের পেছনে। বৈধ কাগজ পত্র না থাকলে মানুষ যে ভাবে যে জীবিকায় টিকে থাকে, সে ভাবেই শুরু করলাম। হয় দোকান, নয় রাস্তায় ফেরী করা নয়তো খাবার ডেলীভারী দেওয়া। আশায় দিন গুনতাম কবে প্রচুর সঞ্চয় করে দেশে ফিরে নিজের ব্যবসা শুরু করবো।

এর মাঝেই একদিন তোমার বিয়ের সংবাদটা পেলাম। ভাবলাম, ভালই হয়েছে। আমার মত নিশ্চয়তাহীন মানুষের জন্য কি আর অপেক্ষা করা যায়?

সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর Jackosn Heights-এর খাবার দোকানে বসে অন্য মানুষের মুখ গুলোতে চোখ বুলাতাম। মনে হতো যেন অনেক অনেক আয়নায় নিজেকেই দেখছি। সবাই আমার মত এক একটি স্বপ্নের ঘোরে সাফল্যের আশায় দিন গুলো কাটিয়ে দিচ্ছে। কেউবা দেশে ঘর বাড়ী সুন্দর করবে কেউবা সংসার শুরুর স্বপ্নে মত্ত।

রাতে ফিরে আসতাম আমার শেয়ারে-ভাড়া-নেওয়া ঘরটায়। এক ঘুমে রাত কেটে যেত, পরদিন আবার শুরু হত জীবন যুদ্ধ।

আজও সকালে খাবারের দোকানটায় কাজ করছিলাম। WTC-এর ৫০ তলায় এক অফিস থেকে Breakfast-এর অর্ডার এলো। এলিভেটর নিয়ে সোজা উঠে গেলাম উপরে। খাবার দিয়ে নামার পথে প্রচন্ড একটা শব্দে কেঁপে উঠলো সব্ আর্তনাদের সাথে কানে এলো, Plane! Terrorist !!

এতো ভয়ের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। যন্ত্রণা, কষ্ট, তীব্র থেকে তীব্রতর হলো বেদনা। এতো কষ্টও পৃথিবীতে আছে? ব্যথায় ব্যথায় অসহ্য ব্যথায় সঙ্গা হারালাম আমি।

যখন জ্ঞান ফিরলো দেখলাম রঙ্গ। রঙ্গটা লালচে কালো আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। অনুভবে শুধুই রঙ্গ।

আস্তে আস্তে নিজেকে ফিরে পেতে শুরু করলাম। রঙ্গটাও পাল্টাচ্ছিল। একসময় ধোঁয়াটে সাদা, তারপর কিছুটা সচ্ছ হয়ে এলো। এখন অস্পষ্ট হলেও দেখতে পাচ্ছিলাম। ইন্দ্রীয়গুলো কার্যক্ষম কিনা যাচাই করার মত অবস্থায় ছিলাম না। প্রাণ থাকাটাই অনেক। কোথায় আছি বোঝার চেষ্টা করলাম। তীব্র কষ্টটা আবার ফিরে এলো। প্রচন্ড ভয় আর রাগে আর্তনাদ করলাম।

কেন এমন হবে? কেন? কেন আমার এতো কষ্ট পেতে হচ্ছে? অসহ্য অন্তহীন যন্ত্রনা। আপ্রাণ চেষ্টা করলাম শরীরে অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলোকে নিজের বশে এনে এক ধাক্কায় ভগ্নস্তুপ থেকে ভেঙ্গেচুড়ে বেরিয়ে আসতে। মুক্ত ঝলমলে আলোকিত আকাশের নিচে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে।

উফ্, কি তীব্র কষ্ট। বাতাস কমে যাচ্ছে। ধোঁয়ায় শ্বাস রোধ হয়ে আসছে। আমি পারছিনা, পারছিনা, তলিয়ে যাচ্ছি। আমার অতীত বর্তমান মিলেমিশে একাকার হয়ে

যাচ্ছে। উম্মাদের মত চিৎকার করে কাঁদলাম, কেন? কেন? কি আমার অপরাধ? কেন আমি আর দশজনের মত জীবনটা সুখে দুঃখে কাটিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছতে পারবো না? আমি তো জ্ঞানতঃ কারো কোন ক্ষতি করিনি, কারো প্রতি কোন অভিযোগ করিনি। নিয়তির সব দান আর কশাঘাত নীরবে মেনে নিয়েছি।

আমি তো কখনো রাজনীতি করিনি। বৈরী দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক দ্বন্দ্বের মাসুল আমায় কেন দিতে হবে - আমার এই খেটে খাওয়া নীরিহ জীবন দিয়ে?

এক সময় যন্ত্রনাটা অবশ হয়ে এলো। প্রচন্ড আক্রোশ, আস্ফালন, ব্যর্থতা আর হতাশার পরে আমি মেনে নিলাম এই আমার অদৃষ্ট। আমায় কেউ বাঁচাতে আসবে না। অক্সিজেন কমে কমে এক সময় আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবো। অনন্ত ঘুম। কখনো তোমায় দেখবো না। দেশ, পরিবারের কাউকে দেখবো না। কোন স্বপ্নই আমার সত্যি হবে না।

আচ্ছা? এই জীবনের পরেও নিশ্চয়ই আত্মার অস্তিত্ব আছে, তাইনা? এই পৃথিবীই যদি সব হয় তাহলে আমার জন্ম, এই জীবন, মৃত্যু সব অর্থহীন হয়ে যাবে। কোন প্রয়োজনে আমার সৃষ্টি? কার উপকারে আসলাম? কি উপহার দিয়ে গেলাম আগামী প্রজন্মের জন্য? আচ্ছা দেশের ফুটপাতের সংসারে কত শিশু জন্মে অকালে মারা যাচ্ছে, তাদের জীবনের অর্থ কি ছিল? না, না জীবনের মত এতো নিঁখুত সুন্দর বিস্ময় নিরর্থক হতে পারে না।

এক ধরনের স্থবির প্রশান্তি আমার আচ্ছন্ন করেছে। আমি ঠিক করলাম, তোমায় চিঠি লিখে লিখে সময়টা কাটিয়ে দেই। তোমায় দেখতেও পাচ্ছি। হলুদ উজ্জল পূর্নিমার মত বিশ্বজোড়া তোমার সহানুভুতি মাখা মুখ।

আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। যদি ঘুম ভাঙ্গে তাহলে আবার লিখবো, কেমন? আর যদি কখনো দেখা না হয়; তুমি ভাল থেকো, সুন্দর করে জীবনটা কাটিয়ে দিও। দৈনন্দিন জীবনের চার দেয়ালের মাঝে থেকেও তোমার মনের দরজা জানালা গুলো খোলা রেখো, যেন আনন্দের বাতাস সজীবতা এনে দেয়।

ছোট্ট স্মৃতির জানালাটা দিয়ে কোন অলস দুপুরে আমি হঠাৎ হাওয়ার মত এসে তোমার এলো চুল ছুঁয়ে দিয়ে যাবো। আর এমনি করেই চিঠি লিখে যাবো অনন্ত কাল। বহু বহু বছর পরে ইজিচেয়ারে বসে উল বুনতে বুনতে প্রৌঢ়া মহিলাটি যদি অন্যমনস্ক হয়ে আমার কথা ভাবে তবেই বুঝবো অন্য পার থেকে লেখা আমার চিঠিগুলো গন্তব্য খুঁজে পেয়েছে।

ও কি? ও কিসের শব্দ? গাড়ীর? দুর থেকে ভেসে আসা কারো কণ্ঠস্বর? আমায় কি কেউ উদ্ধার করবে, আমি কি বেঁচে যাবো? নাকি সবটাই আমার কল্পনা, শব্দটাই মন গড়া?

সন্দেহ

ডেরিক গনছালবেস, ম্যানহাটান, নিউইয়র্ক

কুসংস্কার মানুষকে বোকা বানায়, আর সন্দেহ তাকে পাগল করে তোলে - কথাগুলো একবার নয়, অন্তত দশবার পড়ল রীতা, তাহলে কি সে পাগল হয়ে যাচ্ছে?

এইতো সকালে বেরুনোর সময় তরুও এই কথা বলে গেছে। শার্টের সঙ্গে একটা টাই বেছে দিতে বলেছিল। তার উত্তরে রীতা বলল (ডেটিংয়ে) বাইরে যাবে। নিজের জিনিষ নিজে বের করে নাও। রীতা নিজেও জানে না কেন বলল কথা টা। আজকাল মাঝে মধ্যে তার এমন হয়। স্বামীকে নিয়ে অদ্ভুত সব গল্প তৈরী হয় মনের মধ্যে। রীতা জানে, শার্টের সঙ্গে টাই পরা তাদের অফিসের পোশাকের অংশ। এরকম অনেক ডেকোরাম মেনে চলতে হয় তার স্বামীকে। বিয়ের দু'বছর ধরে এগুলো বুঝে ফেলেছে রীতা। বিভিন্ন পার্টিতে গিয়ে দেখেশুনে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছে। স্বামীর সংসারের বাইরের সংসারটাকেও। কিন্তু কিছু দিন ধরে নিজের মধ্যে অস্থিরতা টের পাচ্ছে সে। বিশেষ করে ঘন ঘন এক মহিলা সহকর্মীর ফোন আসার পর থেকে মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছে তার। অনেক বার মনে হয়েছে স্বামীকে প্রশ্ন করে। আবার মনে হয়েছে তার কি গরজ! স্বামী কি তাকে কিছু বলতে পারে না।

এ হলো দাম্পত্যের এবারের গল্প। সন্দেহ শুধু দাম্পত্যে নয়, যে কোন সম্পর্ক ভাঙনের জন্যই যথেষ্ট। তবে দাম্পত্যের সন্দেহ বেশী ঘনীভূত হয় তৃতীয় একজন মানুষকে ঘিরে। স্বামীর জীবনে অন্য-নারী এবং স্ত্রীর জীবনে অন্য পুরুষ উঁকিঝুঁকি মারছে কিনা তা নিয়ে শুরু হয় সন্দেহের মালা গাঁথা। প্রতিদিন মালায় একটা করে পুঁতি যুক্ত হয়। তারপর একদিন সুতোটা ছিঁড়ে গিয়ে সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এলোমেলো হয়ে যায় স্বাভাবিক জীবনের ছবিটা।

পাজেল খেলেছেন কখনোও? টুকরো টুকরো ছবি ঠিক মতো জুড়ে একটা সুন্দর ছবি বানিয়ে ফেলে শিশুরা। কিন্তু ছবিটা এলোমেলো জুড়লে খুব হাস্যকর কিছু একটা দাঁড়ায়। শিশুরা কিন্তু ভেঙ্গে পড়ে না। ঠিক ছবিটা দাঁড় না করানো পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হয় না। এক্ষেত্রে তাদের একমাত্র হাতিয়ার যদি হয় ধৈর্য্য তাহলে আপনার হবে না কেন? কেন এত বড় মানুষ হয়েও আপনি জীবনের ছবিটাকে জুড়তে পারবেন না। অধৈর্য্য নামের বাজে অসুখ পুষে পুষে কেন নিজেকে অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

সন্দেহ বিষয়টা হচ্ছে বরফ ঘরে রাখা বরফের মতো আপনি ওখানে বসে বসে যতই বরফ গলাতে চান না কেন তা গলবে না। পানি ঢালবেন? সেটাও বরফ হয়ে যাবে। অর্থাৎ নিজে নিজে যত ভাববেন, ভাবনা ততই জমাট বাঁধতে থাকবে। তা হলে কি করা? প্রথম কাজই হচ্ছে এক ঝটকায় নিজেকে বরফ ঘর থেকে বের করে আনা। নিজের মধ্য থেকে নিজেকে বের করে আনুন। যাকে নিয়ে সন্দেহ তাকে সরাসরি প্রশ্ন করতে হবে। সমস্যা বাড়বে, অপর পক্ষে রাগারাগি বাড়বে, ঝগড়া হবে? হোক না, এমন হলে বুঝবেন বরফে গরম পানি পরছে।

সন্দেহকে অসুস্থতার পর্যায়ে নিয়ে যেতে না চাইলে দ্রুত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। যখনই একজন আরেকজন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবেন সরাসরি পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে না পারলে নির্ভরশীল কাউকে জানান; যিনি বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে কৌশলে জেনে নিতে পারবেন। তাছাড়া আলোচনা করলে এমনিতে অনেক কিছু স্বচ্ছ হয়ে যায়। কথায়, যুক্তিতে, তর্কে অনেক কথা বলার পর দেখা যায় নিজের ভাবনাটাই সত্য নয়, এর বাইরেও ভাবনার কিছু আছে।

মনকে অবশ্যই নীল আকাশে ঘুড়ির মতো উড়তে দেবেন তবে নাটাইটা ঠিকঠাক মতো ধরতে হবে নিজের হাতে। সন্দেহের বীজ একবার বোনা হয়ে গেলে তা উপড়ে ফেলা বেশ কঠিন। আগাছার শক্ত শিকড়ের মতো তা কেবল ভিতরেই ঢুকে যেতে থাকে। ভালবাসার মানুষটিকে সন্দেহ করার আগে দু'বার ভাবুন। কারন, পরে এমন কোন সত্য বেরিয়ে আসতে পারে যখন লজ্জা পাওয়া বা নিজের কাছে ছোট হয়ে যাওয়া ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

বঙ্গে পর্তুগীজ প্রভাব

জুলিয়ান গমেজ, ম্যানহাটান, নিউইয়র্ক
সংগ্রহেঃ **ব্যাঞ্জামিন রোজারিও**, বেয়ন, নিউজার্সী

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ, ৮ই জুলাই শনিবার। পশ্চিম ইউরোপের এক অতি ক্ষুদ্ররাজ্য - পর্তুগাল। রাজধানী লিসবন থেকে দেশ আবিস্কারের নেশা নিয়ে একদল নাবিক বেরিয়ে পড়লেন অজানা সমুদ্রে। বাণিজ্য করার গোপন ইচ্ছা তাঁদের প্রেরণা যুগিয়েছে। অধিনায়ক ভাস্কো-দা-গামা সঙ্গে ১৬০ জন নাবিক। অদম্য উৎসাহ আর অকুণ্ঠ আশা নিয়ে তাঁরা চলেছেন ভারতে আসার পথের সন্ধানে। সোনার দেশ ভারত স্বপ্নের দেশ ভারত। পথের বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে, ঝড়বৃষ্টি - বজ্রপাতের বিপদকে তুচ্ছ করে আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে অবশেষে বুঝি তাদের প্রচেষ্টা সার্থক হলো। দীর্ঘ এক বৎসর পর ভারতের পশ্চিম উপকুলে কালিকট বন্দরে তাঁরা এসে পড়লেন। অনেকদিনের প্রচেষ্টা সফল হলো। সুদূর লিসবন নগর আনন্দ উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠলো।

গামাকে অনুসরণ করে আরো অনেকে আসতে লাগলেন ভারতে। বাণিজ্য করার আকাঙ্খা দেশ জয়ের আগ্রহে রুপান্তরিত হলো ধীরে ধীরে। অনতিকালের মধ্যেই কানানোর, বোম্বাই, কচিন, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি খন্ডরাজ্যগুলি বাধ্য হলো কামানের সামনে মাথা নোয়াতে। গোয়া নগরী হয়ে উঠলো পর্তুগীজদের প্রধান কর্মস্থল এবং রূপ নিলো রাজধানীর। এখান থেকে পর্তুগালের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করতে লাগলেন। গভর্ণর আলবুর্কাকের বীরত্ব আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের বুকে পর্তুগালের শক্তিকে রাজশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করলো ক্রমে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজের হাত থেকে তিনি গোয়া দখল করেন। এবং কালিকটে দূর্গ স্থাপন করেন। আলবুর্কাক ছিলেন অসাধারণ সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। কি শান্তির সময়, কি যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল অসাধারণ। মাত্র ৪০০ সৈন্য নিয়ে তিনি যে কার্য সমাধান করেছেন অপরের ২০,০০০ সৈন্য নিয়েও তা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। তাঁর সুশাসনে গোয়াবাসীরা শান্তিময় জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েছিল। তারা সর্বদা তাদের প্রিয় শাসকের মঙ্গল কামনা করতেন এবং মৃত্যুর সময় গোয়ার দেশীয় প্রজারাও অশ্রু বিসর্জন করেছে।

ধীরে ধীরে গোয়া রোমের তুল্য অতি সুন্দর এক নগরীতে পরিণত হয়। শহরে জাঁকজমকের অভাব ছিল না। বিত্তবান লোকেরা পাল্কি কিংবা ঘোড়ায় চড়ে প্রশস্ত রাজপথে বেড়াতেন। মহিলারা ছিলেন অন্তপুরচারিণী। বাইরে বার হবার সময় মুখের পর্দা ব্যবহার করতেন। রান্নার কাজে, কণ্ঠ সঙ্গীতে, বীণা বাদনে তাদের দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

বঙ্গে অভিযান

ক্রমে ক্রমে পর্তুগীজ অধিনায়কদের বাংলাদেশের দিকে নজর পড়লো। নদী প্রধান বাংলাদেশ সহজেই আকর্ষন করলো বিদেশী এই নাবিকদের। গামা ভারতে আসার প্রায় কুড়ি বছর পরে গোয়া থেকে 'সিলভেরা'(১) নামে একজন নাবিক প্রথম বাংলাদেশে এলেন বাণিজ্য বিস্তারের আশায়। তিনি প্রথমে চট্টগ্রামে এসে এখানকার রাজার কাছে ব্যবসা করার জন্য অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ফল হলো উল্টো। আরাকানরাজ সন্দেহ করলেন সিলভেরাকে। হঠাৎ তিনি যুদ্ধ ঘোষনা করলেন সিলভেরার বিরুদ্ধে। হতাশ হয়ে সিলভেরা সিংহলে ফিরে গেলেন।

তারপর অভিযান চালালেন সেনাপতি 'পেরেরা'(২)। ইনিও বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারেন নি। কিছুকাল পরে 'মেল্লো'(৩) নামে আর এক সেনাপতি এলেন। বাংলার রাজধানী তখন গৌড়ে, মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল। ইনি প্রথমে আরাকানে এসে রাজার কাছে বাণিজ্যের প্রস্তাব করেন। কিন্তু নবাব খুদাবক্স খাঁ তাঁকে বন্দি করে রাখতে চাইলেন। তিনি পালাতে চেষ্টা করলে আর এক বিপদ উপস্থিত হলো। আরাকানের কিছু সংখ্যক প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মন প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল যে তারা পর্তুগীজদের কাছে পেলে তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে সুপুরুষ তাকে দেবতাদের কাছে বলি দেবে। মেল্লোর এক অতি অল্প বয়স্ক ভাইপো ছিল। এই সুন্দর ছেলেটাকে তারা নিয়ে যায় এবং বিনা কারনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। মেল্লো নিজে মুক্তি পান এবং দ্বিতীয়বার এসে বহু টাকার উপহার নিয়ে মহম্মদ শাহের সাথে দেখা করলেন। কিন্তু ফল হলো না। নবাব তাঁর ধনরত্ন কেড়ে নিয়ে তাঁকে বন্দী করে রাখলেন। নবাবের দুর্ব্যবহারে গোয়ার গভর্ণর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে 'মেনেজেস'(৪) -কে পাঠালেন উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবার জন্যে। সরাসরি যুদ্ধ আরম্ভ হলো। মেনেজেস চট্টগ্রামের একটা বিরাট অংশ ধ্বংস করে ফেললেন। এমন অবস্থায় নবাবের পক্ষে মেল্লোকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করাই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু নবাব তা করেনি। কারন এই সময় বিখ্যাত আফগান বীর শের শাহ বাংলাদেশ আক্রমন করলেন। তখন মহম্মদ শাহ বিদেশী পর্তুগীজদের সাহায্য চাইতে বাধ্য হলেন। পর্তুগীজদের পক্ষেও এই সুযোগটি অত্যন্ত লাভজনক হলো। মেল্লো মুক্তি পেলেন এবং নবাবকে যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে লাগলেন। পর্তুগীজরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করলো কিন্তু আফগান বাহিনীকে রোধ করা সম্ভব হলো না। মহম্মদ শাহ পর পর দুইবার পরাস্ত হন।

পরাজিত হয়েও নবাব তার দুঃসময়ের বন্ধুদের ভুলে যান নি। তিনি সাতগাঁ ও চট্টগ্রামে তাদের বাণিজ্য করার অধিকার দিলেন। অনেকদিনের সংগ্রাম অবশেষে শেষ হলো। বাংলাদেশে পর্তুগীজ প্রভাবের এই হলো গৌরব কথা। কালক্রমে চট্টগ্রামই হয়ে উঠলো পর্তুগীজদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। সেযুগে চট্টগ্রামের আধিপত্য নিয়ে বাংলা আরাকান ও ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে বরাবরই যুদ্ধ হতো। পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা বাংলায় এসে প্রথমে চট্টগ্রামে প্রবেশ করতো এবং বাংলাদেশ বলতে শুধু চট্টগ্রাম বুঝতো তারা। এখানে বড়ো বড়ো জাহাজ আসার সুবিধা ছিল বলে স্থানটিকে তারা বলতো "বড় বন্দর"। সাতগাঁয়ে সে সুবিধা ছিলো না। ভাগীরথী নদীর অগভীর জলে তারা বড়ো বড়ো জাহাজ চালানোর সুবিধা পেতো না। মুচিখোলার কাছে নোঙর ফেলে তারপর মালপত্র ছোট ছোট নৌকায় করে সাতগাঁয়ে নিয়ে আসা হতো। সাতগাঁয়ের কাছাকাছি বেতড় গ্রামে তারা নিজেদের মালপত্র রাখার জন্য ছোট ছোট খড়ের ঘর তৈয়ারী করতো। আর সমুদ্রে চলে যাবার সময় তারা ঘরগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে যেতো। কিছুকাল এভাবে ব্যবসায়ের কাজ চালানোর পর হুগলীতে ব্যবসা করার জন্য স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করা হলো। পর্তুগীজরা বাংলায় এসে প্রথমদিকে মুসলমান রাজাদের কাছ থেকে কোন সহানুভূতি পায়নি। এর একটা কারনও ছিলো। ভাস্কো-দা-গামার কয়েক শ'বৎসর আগে ইউরোপের খ্রীষ্টানদের সাথে তুর্কীদের যুদ্ধ হয় পবিত্র জেরুযালেমে প্রবেশের অধিকার নিয়ে, সে ক্রুসেডের (জেহাদ) কথা আমরা ইতিহাসে পড়ে থাকি। তুর্কিরা খ্রীষ্টানদের জেরুযালেমে প্রবেশ করতে দিতো না। বরং অত্যাচার করতো। দু'পক্ষের মধ্যে পায় একশ' বছর যুদ্ধ চলে কিন্তু খ্রীষ্টানরা পুরোপুরি জেরুযালেম জয় করতে পারেনি। গামার সময়েও সে যুদ্ধের আবহাওয়া কিছুটা বজায় ছিল। সুতরাং ঐতিহাসিকদের মতে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের সাথে পর্তুগীজদের যে যুদ্ধ হয় তাকে ক্রুসেডের শেষ পর্ব বলতে হবে। যুদ্ধে জলপথে মুসলমানেরা একেবারে পরাস্ত হয়। ২০ বছরের মধ্যে পর্তুগীজ অনুমতিপত্র ছাড়া মুসলমানদের কোন জাহাজ বাণিজ্য করতে পারতো না। এই পরাজয়ের সংবাদ এশিয়ার মুসলমান শাসকদেরও বিচলিত করেছিলো। কিন্তু জলপথে পর্তুগীজদের সর্বোচ্চ প্রভাব থাকলেও স্থলপথে তারা বিশেষ কিছু করতে পারেনি। কারন তাদের লোকবল ছিল নগণ্য।

মহামতি আকবর

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর। তাঁর পুত্র হুমায়ুন যদিও পিতার সিংহাসনে বসেছিলেন কিন্তু শের শাহের হাতে পরাজিত হয়ে তাঁকে কিছুকালের জন্য সিংহাসন ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল ভাগ্যহীনের মত। শের শাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন আবার দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তার পুত্র আকবর ১৫৫৬ সালে সিংহাসনে বসেন।

পাক-ভারতের ইতিহাসে আকবরের নাম অমর হয়ে থাকবে। কি বীরত্বে, কি রাজ্যশাসনে কোন দিকেই তিনি কম ছিলেন না। আর তাঁর আর এক গুণ ছিল যে তিনি পরের ধর্ম কিংবা মতকে সুন্দরভাবে মানিয়ে নিতে পারতেন। সে যুগের পক্ষে যে এটা মহৎ গুণ ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। পরের মত বা ধর্মকে পুরোপুরি অস্বীকার করাই ছিল সে যুগের বৈশিষ্ট্য। আকবর এই দিক থেকে মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তিনি জানতেন হিন্দুস্থান হিন্দুদের দেশ, আর মুসলমানরা দেশের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সুতরাং হিন্দুদের সহানুভূতি না পেলে তাঁদের পক্ষে টিকে থাকাই অসম্ভব। তাই তিনি হিন্দুদের সঙ্গে মিলনের সুন্দর চেষ্টা করেছিলেন। খ্রীষ্টানদের প্রতিও তাঁর কোন বিরুপ মনোভাব ছিলনা। খ্রীষ্ট ধর্ম জানবার জন্য তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো। সাতগাঁ আর গোয়া থেকে তিনি কয়েকজন পাদ্রীকে এই জন্য রাজধানীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। এঁদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ধর্মের কথা আলোচনা করতেন। শুধু তাই নয় পুত্র মুরাদকে পর্যন্ত তিনি পর্তুগীজ ভাষা আর খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন পাদ্রীকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে পাদ্রীদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। এঁদের গলা জড়িয়ে ধরে তিনি উদ্যানে ভ্রমণ করতেন। তিনি একজন আরমানীয় খ্রীষ্টান ছেলেকে পর্যন্ত পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহন করেছিলেন। পরে ছেলেটি মির্জা জুলকার নাইন নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ইনি পরবর্ত্তীকালে খ্রীষ্টানদের অনেক উপকার করেছিলেন। এটা সত্য কথা যে আকবরের আমলেই পর্তুগীজরা প্রথম সম্রাটের সহযোগীতা লাভ করেছিলেন।

আকবর পর্তুগীজদের বাংলাদেশে ব্যবসা করার পূর্ণ অধিকার দিলেন। সম্রাটের অনুমতি লাভ করার পর পর্তুগীজরা ১৫৮০ সালে হুগলীতে স্থায়ীভাবে বাণিজ্য ও বসবাস করবার জন্য আসে। সাতগাঁয়ে তখন ভাঁটা পড়েছে, সেইজন্য হুগলীকে তারা নিজেদের কর্মকেন্দ্র হিসাবে বেছে নেয়। পর্তুগীজরা এসেই নিলো প্রথমে আত্মরক্ষার উপায় করে। গোলাঘাটে এই উদ্দেশ্যে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হলো এবং এমনিভাবেই আধুনিক হুগলী শহরের গোড়া পত্তন হলো। "হুগলী" নামটিও সম্ভবত পর্তুগীজদেরই দেওয়া। সেকালে ভাগীরথীর তীরে বহু হোগলা গাছ জন্মাত - এই হোগলা থেকেই "হুগলী" নামটি হয়েছে। হুগলীর মধ্যে বাবুগঞ্জ, ব্যান্ডেল পিপুলকাতি প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী ছিল। অনতিকালের মধ্যেই পর্তুগীজরা এ অজানা পল্লীতে এক অভিনব শহর গড়ে তুললো। কালক্রমে বাংলাদেশের বাণিজ্য এখানেই কেন্দ্রীভূত হয়। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যান্ডেলে একটি গীর্জাও স্থাপন করা হয়। এই সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দরে তাদের জাহাজ চলাচল শুরু হয় এবং গোটা বাংলা দেশই তাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠে।

এইবার বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চল তাদের সরাসরি সংযোগে এসেছিলো, সেই সমস্ত অঞ্চল কয়েকটা কথা আলোচনা করা যাচ্ছে।

ঢাকা

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে পর্তুগীজরা ঢাকায় আসে। ঢাকা ছিল সে সময়ে বাংলার রাজধানী এবং খুবই সমৃদ্ধ অঞ্চল। বিভিন্ন হস্ত শিল্পকে কেন্দ্র করে এখানে বাণিজ্য গড়ে উঠেছিলো। মানেশ্বর, নারানদীয়া, ফুলবাড়িয়া এই সমস্ত স্থানে বহু খ্রীষ্টান বাস করতো যাদের মধ্যে বিদেশীরাও ছিলো।

শ্রীপুর

চাঁদরায় ও কেদার রায়ের নাম নিশ্চয়ই প্রায় সকলেরই জানা আছে। এঁদেরই রাজধানী শ্রীপুর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কেদার রায় সামান্যমাত্র এক জমিদার হয়েও সম্রাটের সেনাপতিকে পরাস্ত করেছেন। দিল্লীশ্বরকে চোখ রাঙিয়েছেন। এই কেদার রায়ের শক্তির মূলে ছিলো পর্তুগীজরা। কেদার রায় জলযুদ্ধে পটু পর্তুগীজদের সাহায্য গ্রহন করেছিলেন আর পর্তুগীজরাও তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বাংলাদেশের ভূস্বামীকে সাহায্য করেছিলেন। শ্রীপুরে পর্তুগীজরা যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেছিলো।

লড়িকুল

ঢাকা শহরের ২৮ মাইল দক্ষিণে পদ্মানদীর তীরে লড়িকুল, নুনের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত ছিলো। সে যুগের বন্দরটিকে মনে হয় পদ্মানদী গ্রাস করেছে। হাসনাবাদের মিশন এখান থেকে মাত্র দশ মাইলের মধ্যে ছিল। বর্তমানের "লক্ষীকুল" লড়িকুলেরই অন্যনাম বলে মনে হয়। বর্তমানে এ অঞ্চলে কোন খ্রীষ্টান বাসিন্দা নেই। লক্ষীকুলের কাছাকাছি মানিকান্দা গ্রামে মাত্র একটা দেশীয় খ্রীষ্টান পরিবার বাস করে। এই সময় পূর্ববঙ্গের কাত্রাবোয়ে (কর্ত্তভুপুর) ঈশা খাঁ রাজত্ব করছিলেন। তাঁর অধীনেও বহু পর্তুগীজ যুদ্ধ করেছে। বাখরগঞ্জের (বাক্‌লা) রাজার সঙ্গেও পর্তুগীজদের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। রাজা পরামঞ্চ রায় গোয়ার সঙ্গে এক বাণিজ্য চুক্তি করে ভারত সাগরে ও আরব সাগরে বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ করেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্য চন্ডীখানেও পর্তুগীজদের প্রভাব কম ছিল না। পর্তুগীজ রুডা ছিলেন প্রতাপাদিত্যের নৌ সেনাপতি। তার সাহায্যে প্রতাপাদিত্য মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখিয়েছিলেন।

বীর কার্ভালো

পূর্ববঙ্গের ইতিহাস থেকে এই সময় কার্ভালো (Domingo Carvalho) নামে এক বীর যোদ্ধার কথা জানা যায়। তিনি পর্তুগালের মন্টার্গিলের লোক ছিলেন। কিন্তু কবে এবং কিভাবে সে এদেশে আসেন তা জানা যায়নি। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের আগে কেদার রায়ের অধীনে চাকরী করার সময় তিনি সন্দীপ জয় করেন। দ্বীপটি লবনের জন্য বিখ্যাত ছিলো। কার্ভালো প্রথম এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মতের বিরুদ্ধে স্থানটি নিজের অধিকারে রাখতে চান। কিন্তু তা পারেননি। পরে চট্টগ্রামের পর্তুগীজ কাপ্তেন মেওসের (Menocl de Mattos) সাহায্য নিয়ে দ্বীপটি হস্তাগত করেন। সন্দীপ পর্তুগালের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এতে সম্রাট খুশী হয়ে এদের দুজনকে "খ্রীষ্টসঙ্ঘের নাইট হুড" উপাধি দিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আবার আরাকানরাজের সঙ্গে আর একটি যুদ্ধে মেওস পরাজিত হন। কার্ভালো তাঁর বন্ধুর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন এবং আরাকানের সমস্ত নৌবহর আটক করেন। মগ রাজা তার রাজ্যের বহু পর্তুগীজকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিলেন। উভয় পক্ষে দু'বার যুদ্ধ হলো। এবারও আরাকানরাজ পরাজিত হলেন। কিন্তু সন্দীপের অধিবাসীরা কার্ভালোকে চাইলো না। তাই বাধ্য হয়ে তিনি শ্রীপুরে ফিরে গেলেন। এমন সময় শ্রীপুর মোগলেরা আক্রমন করে। কার্ভালো মাত্র ৩০টি জালিয়া নৌকা নিয়ে বিরাট মোগল বাহিনী ধ্বংস করলেন, শ্রীপুর রক্ষা পেলো।

এরপর কার্ভালোকে আমরা হুগলীতে দেখতে পাই। স্থানীয় পর্তুগীজদের সাহায্য নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলতে চাইলেন। এবার তাঁকে এক মহা আক্রমণের সম্মুখীন হতে হলো। মাত্র ৮০ জন সঙ্গী নিয়ে তিনি যখন হুগলী যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ মোগলদের এক বিরাট বাহিনী তাকে আক্রমণ করে। কিন্তু বীরের মত যুদ্ধ করে এই ৮০ জন সঙ্গী নিয়েই তিনি পরাজিত করেন। এটাই ছিলো তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ। কথিত আছে যে তারপর তিনি চন্ডীখানে চলে আসেন। এখানকার রাজা তাঁকে ভোজসভায় নিমন্ত্রন করেন। কার্ভালো কিছু আশঙ্কা না করে একাই উপস্থিত হন। হঠাৎ রাজার অনুচরেরা নিঃসহায় কার্ভালোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বন্দী করে। এরপর তাঁকে হত্যা করা হয়। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় কে এই বিশ্বাসঘাতক? এবং কেনই বা এই বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো? আরাকানরাজকে পরপর পরাস্ত করে কার্ভালো সারা বাংলাদেশে খ্যাতিলাভ করেছিলেন একথা সত্য। এবং তাঁকে ধ্বংস করার জন্য আরাকানরাজ চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। সম্ভবতঃ আরাকানরাজের সাথে বন্ধুত্ব করার অভিপ্রায়ে চন্ডীখানের রাজা কার্ভালোকে হত্যা করেন। ঐতিহাসিক বেভারিজের মতে কার্ভালোর হত্যাকারী, রাজা প্রতাপাদিত্য ছাড়া আর কেই নয়।

সেনাপতি গঞ্জালেসের রাজ্য গঠন

এই প্রসঙ্গে আর একজন বীর নাবিকের কথাও মনে পড়ে। নাম গঞ্জালেস। পর্তুগালের সামান্য কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। জন্ম থেকেই নেতৃত্ব করবার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসে সৈন্যদলে নাম লেখান। কিন্তু এ চাকরী তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। তাই তিনি নুনের ব্যবসা শুরু করে দেন। হয়তো ব্যবসায় তাঁর বেশ উন্নতি হয়ে থাকবে। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একটি জালিয়া নৌকা কিনেছিলেন। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এই জালিয়া নৌকাসহ আমরা তাঁকে চট্টগ্রামে দেখতে পাই। এই সময় চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের দুঃসময় আরম্ভ হয়েছিলো। রাজা অনেককে হত্যা করেছিলেন- কয়েকজন মাত্র কোনমতে জাহাজে উঠে প্রাণ বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিল। গঞ্জালেস ঐ অত্যাচারিতদের একজন। এর প্রতিশোধ গ্রহনের সুযোগের অপেক্ষায় এদিক ওদিক ঘুরতে থাকেন এঁরা।

মেওসের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র পেরো গমেজ সন্দীপের সিংহাসন লাভ করেন। ১৬০৫ সালে ফতে খাঁ নামে পর্তুগীজদেরই এক কর্মচারী পেরোর হাত থেকে সন্দীপ ছিনিয়ে নেন। ফতে খাঁ কোন রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করতে পারতেন না, বহুসংখ্যক পর্তুগীজও দেশীয় খ্রীষ্টান স্ত্রী-পুত্র সহ তাঁর হাতে প্রাণ হারাতে বাধ্য হয়। ফতে খাঁ গঞ্জালেসকেও বধ করার জন্য ৪০টা জাহাজ নিয়ে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত শাহ্‌বাজপুরে হঠাৎ এগিয়ে এলেন। সারারাত ধরে যুদ্ধ হলো। সকালবেলা দেখা গেল ফতে খাঁর নৌবহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং তিনিও স্বয়ং নিহত হইয়াছেন। পর্তুগীজরা এবার গঞ্জালেসকে নেতারূপে নির্বাচন করে সন্দীপ উদ্ধারের সঙ্কল্প করলো। এই অভিযানে বাখরগঞ্জের রাজা তাঁদের কয়েকটি জাহাজ এবং ২০০টি ঘোড়া দিয়ে সাহায্য করলেন। উদ্দেশ্য সফল হলো। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে গঞ্জালেস সন্দীপের অধিপতি হয়ে বসলেন। স্থানীয় প্রজারা তাঁকে সাদরে অভিনন্দন জানালো। গঞ্জানেসের রাজ্যকে পর্তুগালের সাম্রাজ্য ভুক্ত বলা যায় না, কারন তিনি গোয়ার শাসনকর্তার অধীনে কাজ করেন নি, স্বাধীনভাবে রাজ্য গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সন্দীপের আইন কানুন প্রবর্তন করেন। বাণিজ্যের জন্য শুল্কগার (Custom House) নির্মাণ করেন। এইবার বাখরগঞ্জের অধিপতি সন্দীপের রাজস্বের একাংশ চাইলেন। এতে কিন্তু গঞ্জালেস সম্মত হলেন না। তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে লাগলেন। ক্রমশই তাঁর খ্যাতি বাড়তে লাগলো। তাঁর সৈন্য বাহিনীকেও তিনি শক্তিশালী করে তুলতে চাইলেন। ১,০০০ পর্তুগীজ, ২০০ অশ্বরোহী এবং ৮০টি জাহাজ তাঁর সৈন্যবলের ভিত্তি ছিলো। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি শাহবাজপুর ও পাতলভাঙ্গা দখল করেছিলেন।

আরাকানরাজের সঙ্গের ক্রমশঃ তাঁর বিবাদ অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। আরাকান রাজপরিবার ভুক্ত অনোপরম নামে এক পলাতক তাঁর আশ্রয় গ্রহন করেন, এতে গঞ্জালেসের খ্যাতি আরো বেড়ে যায়। কিন্তু কিছু দিন পরেই অনোপরমের মৃত্যু হয়। অনেকের বিশ্বাস তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়। অনোপরমের মৃত্যুর পর গঞ্জালেস তাঁর বিধবা পত্নীর সঙ্গে নিজের ভাই আন্তোনিয়োর বিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু মহিলাটি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে ইচ্ছুক না হওয়াতে তা সম্ভব হয়নি। এরপর গঞ্জালেস আরাকান আক্রমন করেন। মাত্র ৫টি জাহাজ নিয়ে আরাকানের ১০০ টি জাহাজের নৌবহর তিনি অবরোধ করলেন। পরাজিত আরাকানরাজ বাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলেন। বিধবা মহিলাটিকে আরাকানে ফিরে যেতে দেওয়া হলো।

জাহাঙ্গীর এই সময় ভারতের সম্রাট। মোগলশক্তির তখন ভরা জোয়ার। দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় মোগলেরা শক্তিশালী হয়ে উঠলে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য আরাকান ও সন্দীপের শাসনকর্তা একত্র হতে বাধ্য হলেন। তাঁরা একযোগে মোগলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রতিজ্ঞা গ্রহন করলেন। কিন্তু মোগলদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ বাঁধলো তখন গঞ্জালেস মোগলদের বাধা দেওয়ার কোন লক্ষণই দেখালেন না। হয়তো তিনি আগেকার পর্তুগীজ হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। আরাকানরাজের সেনাপতিদেরও তিনি হত্যা করেন। অসহায় আরাকানরাজ মোগলদের কাছে মাথানত করতে বাধ্য হলেন। এই সুযোগে গঞ্জালেস আরাকানরাজের অনেক দুর্গও ধ্বংস করেন। গঞ্জালেসের এক ভাইপো এতে প্রাণ হারায়। তিনি নিজেই আরাকানরাজের কাছে সত্যপরায়ণতার জামিনের মত তার ভাইপোকে রেখেছিলেন। ছেলেটিকে বুকে ছোরা চাপিয়ে রাজা তাঁর ক্রোধকে কিছুটা কমাতে চেয়েছিলেন।

আবার ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে গঞ্জালেস মনে করলেন গোয়া থেকে সাহায্য নিয়ে তিনি আরাকান জয় করবেন। পর্তুগালের কাছে নিজের অধীনতা স্বীকার করে বার্ষিক কর দানেও তিনি রাজী হলেন। গোয়া থেকে দু'টি জাহাজ এলো আরাকান জয়ের উদ্দেশ্যে, আর এলেন সেনাপতি আজেভেদো। যুদ্ধ বাধলো। আরাকানরাজ তাঁর যথা সর্বস্ব পণ করে যুদ্ধ করতে এলেন। যুদ্ধ চলছে এমন সময় সেনাপতি আজেভেদো কোন আশা না দেখে গঞ্জালেসকে একা ফেলে চলে গেলেন। এক বৎসর পর আরাকানরাজ গঞ্জালেসের হাত থেকে সন্দীপ ছিনিয়ে নিলেন। ঘটনার ধারা থেকে বিদায় নিলেন গঞ্জালেস। তার এই পতনের জন্য দায়ী অনেকটা গোয়ার শাসনকর্তা।

যুদ্ধ জয়ে নেতৃত্ব করবার মত গুণ গঞ্জালেসের ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। একদিকে মগ অন্য একদিকে মোগল তার মাঝে মুষ্টিমেয় বিদেশীদের স্বাধীনভাবে রাজত্ব করা কম সাহসের কথা নয়। কিন্তু আমাদের ইতিহাসে তাঁর প্রতি সুবিচার করেনি। হয় কোথাও তাঁকে সাধারণ জলদস্যু বলা হয়েছে নয়তো তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করা হয়েছে। আসলে গঞ্জালেস পর্তুগীজদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে রাজ্য গঠন সম্ভব হয়নি কারন বাংলাদেশের উপর ইউরোপের শাসনদন্ড চালাবার সময় তখনও আসেনি। পলাশীর যুদ্ধ তখনও বহুদূরে। যা হোক গঞ্জালেসকে বিচার করতে গেলে তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা আগে বিচার করতে হবে। সমসাময়িক রাজাদের মতোই যুদ্ধ বিগ্রহ-সন্ধি-প্রবঞ্চনা-বিশ্বাসঘাতকতা কোনটাই তিনি বাদ দেন নাই।

গঞ্জালেসের পতনের পর গোয়ার শাসনকর্তা বাংলাদেশ জয় করবার অন্য আর কোন অভিযান পাঠান নি।

হুগলীর পতন

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর দেহত্যাগ করেন। আকবরের পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর নাম

নিয়ে দিল্লীর তক্তে বসেন এরপর। তিনি খ্রীষ্টানদের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইপোদের খ্রীষ্টান হওয়ার অনুমতি দেন। শোনা যায়, মৃত্যুর আগে তিনি নিজেও খ্রীষ্টান হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর শাহজাহানের সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা একেবারে বদলে যায়। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি শাহজাহান তেমন অনুরাগ দেখাননি, তাঁর পুত্র ঔরঙ্গজেবও একমাত্র ইসলাম ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মমতকেই আমল দিতেন না। শাহ্জাহান ও ঔরঙ্গজেব ছাড়া অন্যান্য মোগল সম্রাটেরা সকলেই খ্রীষ্টধর্মকে মোটামোটি ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। হাজার হলেও খ্রীষ্ট যে একজন প্রাতঃস্মরনীয় প্রেরিত পুরুষ একথা সব শিক্ষিত মুসলমানেরই জানা ছিল। যাই হোক, শাহ্জাহানের রাজত্বকালের ইতিহাসটা আমাদের একটু জানা দরকার। জাহাঙ্গীরের শেষ বয়সে নুরজাহান যখন শাহরিয়াকে সিংহাসনে বসবার চক্রান্ত করলেন তখন শাহ্জাহান বিদ্রোহ করেন কিন্তু পরাজিত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। বর্ধমানে বাস করবার সময় তিনি শক্তিশালী পর্তুগীজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাতে তাঁরা সম্মত হয় না। পর্তুগীজদের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের মিত্রতা ছিল, তারা এক বিদ্রোহী রাজকুমারের হয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস করেনি। শাহ্জাহান এতে খুব রেগে যান। ঐ সময়ে তিনি অবশ্য কিছু করেননি। কারন কিছু করবার মতো সামর্থ বা শক্তি তাঁর ছিল না। কিছুকালের মধ্যেই কিন্তু সিংহাসন অধিকার করে পর্তুগীজদের শায়েস্তা করার সঙ্কল্প তিনি গ্রহন করেন। সম্রাটের অন্ত রঙ্গ বন্ধু কাশেম খাঁ তখন নবাব। তিনি তাঁকে হুগলী আক্রমণ করার আদেশ দিলেন। নবাব তখন পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে দস্যুবৃত্তি আর বহু কুকীর্তির নজির তুলে যুদ্ধ ঘোষনা করলেন। এখানে বলা দরকার কাশেম খাঁ তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনে তা অতিরঞ্জিত ছিল। মগদের অধীনে যে সমস্ত পর্তুগীজরা চাকরী করতো তাদের কথা আলাদা - তাদের সঙ্গে হুগলীর পর্তুগীজদের যোগাযোগ ছিল না। হুগলীর পর্তুগীজরা দস্যু ছিল একথা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ করতে পারবেন না। যাহোক ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোগলবাহিনী হুগলী আক্রমন করলো এবং এই আক্রমনে সাহায্য করলো এক বিশ্বাসঘাতক পর্তুগীজ, নাম - মেল্লো। মেল্লো ব্যান্ডেলের ধনরত্ন আর পর্তুগীজদের ভিতরের দুর্বলতার কথা নবাবকে জানিয়ে দেয়। খোয়াজা শের নামে এক নৌসেনাপতি ৫০০ জাহাজ নিয়া হুগলীর দক্ষিণে সর্তক দৃষ্টি রাখলেন, যাতে কোন পর্তুগীজ জাহাজ না পালাতে পারে আর নবাব স্বয়ং উত্তর দিক থেকে আক্রমণ চালালেন। পর্তুগীজ বাহিনীর অধিনায়ক তখন মানোয়েল আজেভেদো। সামান্য মাত্র বাহিনী তাঁর সম্বল। ৩০০ পর্তুগীজ আর ৬০০ দেশীয় খ্রীষ্টান নিয়েই তিনি নগর রক্ষা করতে থাকেন। ৮ জন পর্তুগীজ আর ১২ জন স্থানীয় খ্রীষ্টান গির্জার ছাদ থেকে কামান দাগতে থাকেন। এদিকে নবাব প্রায় ১ লক্ষ সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকেন কিন্তু পর্তুগীজদের বীরত্ব দেখে তিনি সত্যই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দিনের শেষে শত্রুপক্ষের অসংখ্য মৃতদেহ গির্জার সামনে পড়ে থাকতে দেখা গেল, নবাব বহু টাকার দাবী করে অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন। কিন্তু অত টাকা দেওয়ার সাধ্য পর্তুগীজদের ছিল না। তাই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হলো। কিন্তু অল্প কয়েকজন খ্রীষ্টান আর বেশীদিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারলো না তারা দক্ষিণদিকে সরে যেতে বাধ্য হলো। এদিকে নবাবের সৈন্যরা মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে শহরে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে লাগলো। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে সেপ্টেম্বর রাতের বেলায় পর্তুগীজ সৈন্যরা জাহাজে উঠে দক্ষিণ দিকে পালাতে চেষ্টা করে। এদিকে ৫০/৬০ জন সৈন্য শহর থেকে গোলাবারুদ ছুড়তে থাকে। শত্রুপক্ষ তাই কোন সন্দেহ করতে পারেনি যে তারা পালাচ্ছে। পরের দিন প্রবল আক্রমনে শহর ধ্বংস হয়। শহরের মোট ১০,০০০ জন প্রাণ হারায়, বহুসংখ্যক পর্তুগীজ মহিলাও নিজেদের মান বাঁচাবার জন্যে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়। শত্রুপক্ষের নিহতের সংখ্যাও কম ছিল না (প্রায় ৫০,০০০)। ৪,০০০ জনকে বন্দী করে সম্রাটের কাছে পাঠানো হয়, কিন্তু তাঁর সামনে মাত্র ৪০০ জনকে হাজির করা হয়। এদের উপর সেকালের বর্বর শাস্তি দেওয়ার আদেশ জারি করা হয়। পাদ্রীদের অবস্থাও সেই রকম। এঁদের মধ্যে একজন বাঙ্গালী পুরোহিতের নাম পাই। তাঁর অবস্থান ছিলো শ্রীপুর, নাম মনোয়েল গার্সিয়া। মনে হয় বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের ইতিহাসে ইনিই প্রথম পুরোহিত। এই প্রধান ফাদারকে তারা অন্যান্য ফাদারদের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে যায়। জনতা তাঁদের উপর নিষ্ঠুরভাবে কাঁদা আর আবর্জনা ছুড়ে দেয়। সম্রাট এদের হাতীর পায়ের তলায় দিতে চান কিন্তু পর্তুগীজ গভর্ণরের ভয়ে এবং মারোদের অনুরোধে তা করেন নি। অবশেষে তাঁদের কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। কিছুকালের মধ্যেই ফাদার গার্সিয়া মারা যান- আগ্রাতেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। অন্যান্য বন্দীদের মধ্যে অনেককেই মীর্জা জুলকারনাইনের সাহায্যে টাকা দিয়ে মুক্ত করা হয়।

কথিত আছে শাহ্জাহান বন্দীদের মুক্তি দিয়ে তাদের হুগলীতে ফিরে আসার অধিকার দিয়েছিলেন।

এই সম্পর্কে একটা অলৌকিক কাহিনী চলিত আছে। এই রকম বন্দীদের অন্যতম ফাদার দি ক্রুজের জন্য এক নির্মম অত্যাচরের ব্যবস্থা করা হয়। ধর্মভীরু ফাদারকে বিশেষ ভাবে লাঞ্ছনা করার ইচ্ছা ছিল সম্রাটের। একদিন সম্রাট তাঁর পরিষদবর্গকে সঙ্গে নিয়ে ফাদারের সামনে উন্মত্ত হাতীকে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। আশ্চর্যের কথা, হাতীটা তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করলো না। বরং শুড় দিয়ে তাঁকে আদর করতে লাগলো। সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। এই ঘটনাটি সম্রাটের মনে এক বিশেষ সাড়া জাগায় এবং তিনি ফাদারকে মুক্তি দেন। আরও আশ্চর্যের কথা, হাতীটা এতে আহলাদিত হয়ে সম্রাটকে তিন বার কুর্ণিশ করে। গল্পটাকে ঐতিহাসিক বলার কোন যুক্তি নাই। ফাদার হোষ্টনের মতে ফাদার দি ক্রুজ কোনদিনই আগ্রায় যান নি। এবং সম্রাটও বন্দীদের মুক্তি দেননি। তবে কি করে পর্তুগীজরা হুগলীতে ফিরে আসে সে কথা আজও জানা যায়নি।

এই রকম অনেক বিভীষিকা ঘটে গেছে। তা সত্ত্বেও ব্যান্ডেলের গীর্জাটি এখনো অটুট আছে। স্থানটি বিগত কয়েক বৎসরে কত ঘটনারই না সাক্ষ্য বহন করেছে। কিন্তু জাতিই না এখানে নিজেদের স্বার্থে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু এর ঐতিহাসিক গৌরব এখনও নষ্ট হয় নাই। প্রতি বৎসর বহু তীর্থযাত্রী এখানে আসে। বান্দেল ধ্বংসের সময় পর্তুগীজদের অধিকারে আরও দুইটি স্থানের কথা জানা যায়। দু'টিই পূর্ববঙ্গে একটি সিলেট অপরটি চাঁদপুর।

সিলেট

সিলেট বলতে তখনকার দিনে বন্দাশীলকেই বোঝাত। এ অঞ্চলে এখনো খ্রীষ্টানরা বাস করে। বরাকনদীর তীরে খ্রীষ্টানদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে এক মুসলমান নবাবের সঙ্গে আসে। এদের যে কোথা থেকে আনা হয়েছিলো সেকথা অবশ্য জানা যায় নাই। সেই নবাবের নাম ছিল সম্ভবত মীরজুমলা। এসব খ্রীষ্টানরা গোলন্দাজের কাজ করতো। হয়তোবা এরা দেশীয় বা পর্তুগীজই ছিল। বন্দাশীলে এক দুর্গ তৈরী করে খ্রীষ্টানরা তার আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। যুদ্ধের পর নবাব খুশী হয়ে এদের বেশ কিছু জমি দান করেছিলেন। এখানকার খ্রীষ্টানরা বিনা পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহ করত। পরে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করে পাশাপাশি গ্রামের লোকদের কাছে নিজেদের জমি বিক্রি করে দেয়। এদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

চাঁদপুর

স্থানটি সম্ভবত পদ্মানদীর পূর্বতীরে ত্রিপুরা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। প্রায় ২,০০০ খ্রীষ্টান এখানে বাস করতো তার মধ্যে প্রায় ৩০ জন ছিলো পর্তুগীজ। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি গির্জা স্থাপিত হয়েছিল।

চট্টগ্রামে মোগল বিজয়

আরাকানরাজ ছিলেন মোগলদের চিরকালের শত্রু। চট্টগ্রামে মগরা এই সময় মোগল অধিকারভুক্ত বাংলাদেশের উপর ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করেছিল। তারা গ্রামের পর গ্রাম লুট করে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিলো। আর বহুলোককে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিলো। এদের তারা বন্দরে বন্দরে বিক্রয় করে টাকা আয় করতো। এদের শায়েস্তা করা ছিল এক দুরূহ কাজ। নবাব শায়েস্তা খাঁ ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে বাংলায় এসে এদের দমন করার জন্য এক ফন্দি আটলেন। তিনি মগদের শক্তির মূলে রয়েছে কিছু সংখ্যক পর্তুগীজ। এদের হাত না করতে পারলে চট্টগ্রাম জয় করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি ঢাকা অঞ্চলে বসবাসকারী পর্তুগীজদের সাথে বন্ধুত্ব করে চট্টগ্রামের পর্তুগীজদের নিজের দলভূক্ত করে নিলেন। এমন সময় আরাকানরাজের সাথে পর্তুগীজদের এক বিবাদ আরম্ভ হয় আর তিনি তাঁর অনুচরদের কিছুটা সন্দেহও করতে থাকেন। ফলে পর্তুগীজরা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি ৪২টি জালিয়া নৌকায় বোঝাই করে নোয়াখালিতে পালিয়ে আসে। তারপর তারা মোগলদের সঙ্গে যোগ দেয়। শায়েস্তা খাঁ এদের কাপ্তেনকে সসম্মানে গ্রহণ করে এবং দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেন এবং ঢাকা শহরের ১২ মাইল দক্ষিণে বিক্রমপুরের ফিরিঙ্গীবাজারে বসবাস করতে দেন। পর্তুগীজদের সাহায্যে নবাব এবার সহজেই চট্টগ্রাম বশে আনলেন। এই অভিযানে সবচেয়ে বড়ো ফল মগরা এ দেশের নিরহ যত লোকদের বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল তাদের অনেককে মুক্ত করা হয়। আর পলাতক পর্তুগীজরা যারা মোগলদের বিরুদ্ধে এতদিন কাজ করেছে তারাও ফিরিঙ্গী বাজারে মোগলদের আশ্রয়ে বসবাস করার সুযোগ পেলো। এরা এবার ব্যবসাকেই নিজেদের পেশা হিসেবে গ্রহন করে। এদের সর্ম্পকে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর আগেও এখানে এদের বংশধরেরা বাস করত। আশেপাশের মুসলমান চাষীদের মধ্যে মুসলমানদের মতোই থাকতো, অনেকে নাকি মুসলমানও হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে এ স্থানটির কোন অস্তিত্ব নেই। পদ্মার গ্রাসেই মনে হয় জায়গাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখানকার খ্রীষ্টানরা এখন কোথায় আছে তা বলা যায় না। তবে বিক্রমপুর এলাকায় হাশারার কাছাকাছি শোলপুরে কিছু সংখ্যক দেশীয় খ্রীষ্টান এখনও বাস করে। এবং অবশ্য বেশী দিন আগে খ্রীষ্টান হয়েছে বলে মনে হয় না।

কলিকাতা

এদিকে হুগলী নদী তীরের কলিকাতাও তাদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। জব চার্ণককে অনুসরণ করেই তারা কলিকাতায় প্রবেশ করে এবং ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্গীহাটায় একটি গীর্জা তৈরী করে। মুর্গীহাটা বলতে মুর্গীর হাঁট বা বাজার বোঝায়। কলিকাতায় বিভিন্ন জাতীয় ব্যবসায়ীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার ব্যবসাও বেশ জাঁকিয়ে উঠে। কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আসার ফলে ঝগড়া বিবাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ভিন্ন জাতের ভিন্ন ব্যবসায়ী দলের মধ্যে জমি ভাগ করে দেওয়া হয়। এই থেকেই এক একটা বিশেষ জায়গা বিশেষ নামে পরিচিত হয়। মুর্গী বিক্রেতা পর্তুগীজদের ভাগে যে জমি পড়লো সেই বিশেষ জায়গাটিই মুর্গীহাটা নামে পরিচিত হলো। এখানকার স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পর্তুগীজদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাওয়ায় তারা পরে আরও অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ আর এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের মত তারাও কলিকাতায় ধর্মতলা আর বৌ বাজারের মধ্যস্থানটা দখল করে।

১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ

মাইলাপুরের (Mylapore) মহামাণ্য বিশপ্ লেনেস এলেন বাংলায়। এদেশের মিশনগুলো পরিদর্শন করতে। তাঁর সহকারী হিসাবে এলেন ফাদার বার্বিয়ে। ইনি বাংলার বিভিন্ন মিশন পরিদর্শন করে বাংলাদেশের মিশনগুলো সম্পর্কে এক সুন্দর বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। এর থেকে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। এই সময়ে চট্টগ্রামে অনেক খ্রীষ্টান বাস করত। ধীরে ধীরে জামাল খাঁ, খাটোলিয়া, সুলতানপুর, নেয়াপাড়া প্রভৃতি স্থানগুলোতেও খ্রীষ্টানদের বসতি ছড়িয়ে পড়ে। ভুলুয়া অঞ্চলে বহু খ্রীষ্টান বাস করতো। এখানে পর্তুগীজদের প্রভাব এত বেশী ছিলো যে দেশীয় লোকেরাও পর্তুগীজ ভাষা ব্যবহার করতে পারতো। গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০/৪০০ মতো ছিল। পরিশ্রম করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। উসুমপুরে এই সময় প্রায় ২০০০ খ্রীষ্টান বাস করতো। তাদের অধিকাংশই সৈনিকের কাজ করতো। এই সময় "রাঙ্গামাটি" নামে একটি জায়গায় কথা পাই। স্থানটি ব্রক্ষপুত্র নদীর উত্তর তীরে গোলাঘাট মহকুমার অন্তর্গত ছিলো। এখানে পর্তুগীজ সৈন্যদের একটি ঘাঁটি ছিলো। মিশনারীরা এখানে দুইটি গীর্জা নির্মাণ করেছিলেন। এখানকার জলহাওয়া ছিল খারাপ। তাই অধিবাসীরা ছিল রুগ্ন আর অনেক ক্ষেত্রেই বিকলাঙ্গ। ফাদার বার্বিয়ে এ অঞ্চলে থাকাকালীন তাঁর এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে গেছেন। তাঁর বিবরণে এক ভয়ঙ্কর অজগরের কাহিনী পাওয়া যায়। রাঙামাটির অধিবাসীরা ঐ ভয়ঙ্কর অজগরের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলো। বিরাট অজগরটি নদীপথে অদূরে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতো আর নৌকা দেখলে আক্রমণ করে যাত্রীদের গ্রাস করতো। নদীতে যাওয়ার সাহস তাই কারো ছিল না। অবশেষে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত এক আসামীকে অজগরটিকে হত্যার ভার দেয়া হলো। শর্ত রইল- যদি সে অজগরটিকে মারতে পারে, তবে তার মৃত্যুদন্ড মাফ করা হবে। আসামীটি নির্দেশ অনুযায়ী কতকগুলো খড়ের মানুষ তৈরী করে তার ভিতরে লোহার হুক আর বর্শা রাখা হলো। মানুষগুলোকে একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে কলাগাছের উপর বসিয়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। সাপটা তাদের দেখেই নেমে এসে গিলে ফেললো, খড়ের তৈরী সব মানুষগুলোকে। কিন্তু লোহার আঘাতে তার মৃত্যু হলো।

অবলুপ্তির পথে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য

সপ্তদশ শতকের সূচনাতেই পর্তুগীজরা প্রাচ্যদেশে তাদের অধিকার হারাতে শুরু করে। দুইটি মহাদেশে প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে পর্তুগালে নিজেকেই ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করে ফেলেছিলো। তার লোকবল ছিল খুবই কম। দস্যু এবং দন্ডিত আসামীদের মুক্তি দেওয়ার পরও তাদের নৌবহরের জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া যেত না। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ পর্তুগালের রাজা হন। তিনি পর্তুগালকে স্বাধীন রাজ্য বলে স্বীকার না করে বিজিত রাজ্য বলে মনে করতেন। এরকম অধীনতা আর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ কোন জাতি পৃথিবী শাসন করতে পারে না। তার উপর অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কম ছিলো না। তাই কালের অমোঘ নিয়মে পর্তুগালের একচ্ছত্র প্রভাব সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই ভাঙতে শুরু করলো। এবং পর্তুগালের স্থান অধিকার করলো ফরাসী আর ইংরেজ।

চট্টগ্রামের আশ্রয়ে পলাতক পর্তুগীজ দস্যুরা

এদেশে পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের অনেক লোমহর্ষক কাহিনী প্রচলিত আছে। পর্তুগীজদের ইতিহাস আলোচনার পর ঐ কাহিনীসমূহের নায়কদের কথা আলোচনার প্রয়োজন পড়ে। কারণ ঐ কাহিনীসমূহ একটা জাতির চরিত্রে কলঙ্ক লেপে।

সাধারণতঃ দেশীয় লেখকেরা লিখে থাকেন পর্তুগীজ মাত্রই জলদস্যু, বোম্বেটে বা হার্মাদ। বলাবাহুল্য এরা ইতিহাস উপেক্ষা করেছে অতি মাত্রায়। পর্তুগীজরা ছিলো বণিক কিন্তু অপূর্ব রণকৌশল ছিলো তাদের আয়ত্ত্বে। দেশীয় রাজারা এদের রণকৌশলে মুগ্ধ হয়ে এদের সৈন্যদলে নিযুক্ত করেন নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনে। শিবাজী, ঈশা খাঁ, কেযার রায়, প্রতাপাদিত্য দিল্লীর বাদশাদের অধীনেও বহু পর্তুগীজ কাপ্তেন চাকরী করতেন, যে যুগের কথা আমরা বলছি সে যুগে দস্যুতা বা লুটতরাজ ছিলো বীরত্ব দেখানোর নামান্তর মাত্র। উল্লেখযোগ্য যে বহু বাঙ্গালী জমিদারেরাও দস্যুতা করে গৌরব বোধ করতেন। বঙ্কিম চন্দ্রের "দেবী চৌধুরানীই" সে সত্যের ইতিহাস বহন করে। সেই জন্য কিছু সংখ্যক পর্তুগীজ কালক্রমে দস্যুতে পরিণত হয়েছিলো। তবে দস্যুতার ব্যাপারে আরাকানের মগরাই ছিল সিদ্ধহস্ত। যাদের কথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। এবং ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ পর্তুগীজ শক্তির পতনের পর দস্যুতাকেই একমাত্র বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। এরা ছিল গোয়ার শাসনকর্তার সীমানার বাইরে। পলাতক। গোয়া, সিংহর, কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি দেশ থেকে পালিয়ে এসে এরা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল। এরা নামেই ছিল খ্রীষ্টান, ধর্মের দার এরা ধারতো না। এবং এমন কোন কুকর্ম ছিলো না যা এরা করতে পারতো না। খুনজখম লুঠতরাজ, বহুবিবাহ - কোন কুকাজই এদের বাকী থাকতো না। এমনকি ফাদারদের হত্যা করতেও এরা একটুও দ্বিধাবোধ করতো না। এদের শাসন করার কেউ ছিল না। এদেশের অবস্থা তাদের আরও বেপরোয়া করে তুলেছিল। এদেশে এসে তারা নানা ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে সুদূর পর্তুগালের কোন বাঁধন মানতে চাইতো না। আরাকানরাজ এদের আশ্রয় ও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন একান্তভাবেই নিজের স্বার্থে। মোগলদের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় ছিলো এদের সাহায্য। গোয়া কিংবা হুগলীর পর্তুগীজরা এদের ঘৃণার চোখে দেখতো। তবে এইসব দস্যুদের কুকার্যের ইতিহাস ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। আরাকানরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও স্বাধীনতার অবসান ঘটে। তখন এদের বংশধরেরা শান্তিপ্রিয় নাগরিকের মতো মোগলদের আশ্রয়ে ব্যবসা বা চাকরী করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। যদিও এদের ফিরিঙ্গিবাজারে বসবাস করতে দেওয়া হয়েছিল তবুও অনেকে আবার চট্টগ্রামে ফিরে যায় এবং সেখানেই বাস করতে থাকে।

যাই হোক এদের বাদ দিলে সাধারণ পর্তুগীজরা ছিলো সভ্য, ভদ্র এবং গোয়ার শাসনকর্তার আজ্ঞাধীন সুশৃঙ্খল নাবিকমাত্র। এরা নিজেদের সুনাম কখনও নষ্ট করতে চাইতো না। যারা দস্যুবৃত্তি করতে চাইতো তাদের তারা বন্দী করে শাসনকর্তার কাছে পাঠিয়ে দিতো। ঘোর পর্তুগীজ-বিদ্বেষী মুসলমান ঐতিহাসিকেরাও একথা স্বীকার করেছেন। কাফি খাঁর মতে, সমুদ্রে পর্তুগীজরা ইংরেজদের মত নয়, এরা অন্যান্য জাহাজ আক্রমন করে না। কিন্তু যে সমস্ত জাহাজে তাদের অনুমতি পত্র থাকেনা তাদের তারা বাঁধা দেয়।

বর্বর দস্যু হলে আকবর এদের এত সমাদরে অবশ্যই গ্রহণ করতেন না। মোগল সম্রাটেরা এদের ধ্বংস করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। শাহ্জাহান এদের শায়েস্তা করেছিলেন নিতান্ত ব্যক্তিগত কারনে সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্য দেখে কয়েকজন বিচ্ছিন্ন এবং পলাতক দস্যুর কাজের জন্য সমগ্র জাতিকে দোষ দেওয়া যায় না।

জুলিয়ানা

বাংলায় যখন পর্তুগীজ শক্তির পতন হলো দিল্লীর দরবারেও তখন পর্তুগীজদের কোন প্রতিপত্তি ছিলো না। শাহ্জাহানের পর ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করে অন্যান্য ধর্মের বিরোধিতা করেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আবার দিল্লীর দরবারে খ্রীষ্টানদের প্রভাব ফিরে আসে। এই ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেছিলেন জুলিয়ানা নামে একজন তেজস্বী মহিলা। সম্ভবত তাঁর মা-বাপ হুগলীতে বসবাস করতেন এবং হুগলীর বন্দীদের সঙ্গে জুলিয়ানা রাজধানীতে আসেন বাপমায়ের হাত ধরে। তার মাকে এক বেগমের কাছে দাসীর কাজ করতে হয়। জুলিয়ানা ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তার দুই ছেলের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হলে জুলিয়ানা বাহাদুর শাহের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁকে অনেক সাহায্য করেন। কথিত আছে, তিনি বাহাদুর শাহের সঙ্গে একই হাতীতে চেপে যুদ্ধ করেছিলেন। জয় লাভের পর বাহাদুর শাহ জুলিয়ানাকে অনেক পুরস্কার দেন। নারী হয়েও তিনি "চার হাজাবী" উপাধি লাভ করেছিলেন। তার থাকার জন্য বিরাট প্রাসাদ এবং প্রতি মাসে এক হাজার টাকা ভাতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। তবুও জুলিয়ানা অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। খ্রীষ্টানদের রক্ষা করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর সঙ্গে দিল্লীর দরবার থেকে পর্তুগীজদের প্রভাবও লুপ্ত হয়।

আলীবর্দী খাঁ এবং সিরাজ

ঔরঙ্গজেবের জীবনকালেই মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন দেখা দেয়। উপরন্তু তাঁর মৃত্যুর পর শক্তিশালী কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় প্রাদেশিক শাসনকর্তারা একে একে স্বাধীনতা ঘোষনা করতে থাকেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দী খাঁ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাজকার্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিপুণ, সংযত, ধীর এবং স্থির। ব্যক্তি হিসাবে তাঁর চরিত্র প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁর আমলে বর্গীরা সারা দেশটাকে বিভীষিকাময় করে তুলেছিল। এদের দমন করবার জন্য নবাব তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। তাঁরই আদরের দৌহিত্র ছিলেন সিরাজ, -আমিলা বেগমের পুত্র। জন্ম থেকেই সিরাজ ছিলেন অকুতোভয় খামখেয়ালী এবং বিলাসী। আলীবর্দীর মৃত্যুর অতি অল্প বয়সেই সিরাজ বাংলা, বিহার, উড়িষার শাসনকর্তার পদলাভ করেন।

পলাশীর যুদ্ধ

এদিকে বিদেশী ইংরেজ আবার শক্তি সঞ্চয় করে মাথা তুলে দাঁড়ালো। কলিকাতা, কাশিমবাজার এবং আরও নানাস্থানে ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশ জয়ের আকাঙ্খাও তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলো। অনতিকালের মধ্যে তাদের সঙ্গে নবাবের সংঘর্ষ হয়ে উঠলো। নবাব ইংরেজদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের শক্তি মূল ঘাঁটি কলিকাতা আক্রমণ করলেন। নবাবের সৈন্যদলে ২০০ পর্তুগীজ ছিল। এরা কিছু সংখ্যক ফরাসী তাঁর গোলন্দাজ বিভাগে কাজ করতো। যুদ্ধ বিদ্যায় এরা অসাধারণ পারদর্শী ছিলো। তাই ইংরেজরা প্রথমেই চেষ্টা করলো এদের নবাবের হয়ে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখতে। চক্রান্ত করে ইংরেজ পক্ষ কয়েকজন খ্রীষ্টান পুরোহিতের সাহায্যে তিনটি চিঠি নবাবের শিবিরে পাঠিয়ে দিলো। তাতে খ্রীষ্টানদের এই মর্মে অনুরোধ করা হলো যে তাঁরা যেন নবাবের পক্ষে যুদ্ধ না করে অন্ততঃ ধর্মের কারনেই যেন ইংরেজদের সমর্থন করে। কিন্তু তারা ইংরেজদের কথা শোনেনি। অবশেষে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন নবাব কলিকাতায় প্রবেশ করলেন। ইংরেজরা ভীত হয়ে পড়লো, কারন তাদের সৈন্যদল ছিল একেবারে নগণ্য। মাত্র ১৮০ জন, তার মধ্যে আবার অধিকাংশই দেশীয়। কতকগুলি ভলান্টিয়ার জুটলো। মোট সৈন্যসংখ্যা হলো ৫১৫ জন। এই হলো ইংরেজদের শক্তি। ইংরেজ মহিলাদের দুর্গের ভিতরে স্থান দেওয়া হলো। এদিকে পর্তুগীজরা প্রতিবাদ করে জানালো যে তাদের পরিবার পরিজনদেরও দুর্গে স্থান না দেওয়া হলে তাঁরা যুদ্ধ করবেনা। অগত্যা বাধ্য হয়ে তাঁদের দুর্গে স্থানান্তরিত করা হলো। দুর্গ ভরে গেলো। শেষে এদের অনেককে জাহাজে তুলে কলিকাতার দুই মাইল দক্ষিণে এক

নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো, নবাব তার বিরাট বাহিনী নিয়ে দুর্গ ভেদ করলেন। দুর্গের গভর্ণর মিস্টার ড্রেক কাপুরুষের মত পালিয়ে যাওয়ায় সৈন্যেরা হলতয়েল নামে একজন বেসামরিক লোককে সেনাপতি নির্বাচন করে শেষ অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সঙ্কল্প করলো। কিন্তু তিন দিনের মধ্যেই তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হলো। ইংরেজদের বিতারিত করে নবাব কলিকাতাকে "আলিনযার" নামে অখ্যাত করলেন। তারপর হুগলীতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দেরও তিনি স্বস্তির ব্যবস্থা করলেন। এর জন্য পর্তুগীজদের প্রায় ৫,০০০ টাকা দিতে হয়েছিল নবাবকে। বণিকদের শায়েস্তা করার পর নবাব স্বগর্বে দিল্লীতে লিখে পাঠালেন, তৈমুর লঙ্গের দিন থেকে আজ অবধি এটাই হিন্দুস্থানের রাজশক্তির সবচেয়ে বড় কীর্তি।

কিন্তু সহজে নিরস্ত হবার পাত্র ছিল না ইংরেজরা। ক্লাইব এলো মাদ্রাজ থেকে। আর এক যুদ্ধের পর সন্ধির ব্যবস্থা হলো। কিন্তু তাও বেশীদিন টিকলো না। ক্লাইভ নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হলেন। নবাবও আসছিলেন কলিকাতার দিকে। পথে পলাশীর আমবাগানে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটলো। এদিকে মুষ্টিমেয় ইংরেজ, অপর দিকে নবাবের অগণিত সৈন্য। কিন্তু সেনাপতি মীরজাফরের চক্রান্তে যুদ্ধের ফলাফল যা ঘটেছিল আজ কারও অজানা নয়।

শুরু হলো ব্রিটিশ রাজত্ব। পর্তুগীজদের গড়া ভিত্তির উপর তারা এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুললো। লোকবলের অভাবে পর্তুগীজরা যা করতে পারেনি, তাই করলো ইংরেজরা। ইংরেজ রাজত্বে প্রথমদিকে পর্তুগীজদের কিছু কিছু প্রভাব অবশিষ্ট ছিলো। শোনা যায়, ক্লাইভকে দেশীয় সৈন্যদের কুচ্‌কাওয়াজ করাতে পর্তুগীজ ভাষাই ব্যবহার করতে হতো, লোকে তখনও ইংরেজীর সাথে পরিচিত হয়নি।

এই সময় থেকেই পর্তুগীজরা ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের সাথে মিশে যেতে লাগলো। এদের কিছু সংখ্যক দেশীয় খ্রীষ্টানদের সাথেও মিশে গেছে আজ। পর্তুগীজরা মোটেই অহঙ্কারী ছিল না। তারা ভারতীয়দের কোন অবস্থাতেই ঘৃণা করতো না। তারা ইংরেজ রাজত্বের গোড়া থেকেই শহরে বাস করতো, গোলন্দাজ সৈনিক, হোটেল আর বেহালাবাদনের কাজে তারা ছিল পটু। অনেকে কেরাণীর কাজও করতো।

পর্তুগীজদের কাছ থেকে কি পেয়েছি

পর্তুগীজ শক্তির পতন হয়েছে আজ বহুকাল, কিন্তু এদের কাছ থেকে সততার যে কয়টি উপকরণ আমরা পেয়েছি, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার।

এরাই এদেশের ইতিহাসে প্রথম কয়েকটি কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিরোধিতা শুরু করেন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ আলবুকার্ক প্রথম গোয়ায় সতীদাহ আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষনা করেন। এদের পর আকবরও কিছু কিছু সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কিন্তু পর্তুগীজদের মত দৃঢ় হস্তে তিনি সমাজ সংস্কার করেন নি। ভারতের সমুদ্রবর্তী অঞ্চলে বহু অসহায় হিন্দু বালিকা বিধবাদের এরা জ্বলন্ত চিতা থেকে রক্ষা করেন। আধুনিক শিক্ষা এবং সূচনা এরাই করেছিল এদেশে। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ায় প্রথম ছাপাখানা এরাই নির্মাণ করে। প্রথম বাংলা বই ছাপানো হয় লিসবনে পর্তুগালের রাজধানীতে। বাংলাদেশের অধিবাসীদের এরা অনেক নূতন জিনিষ ব্যবহার করতে শেখায়। বিশেষ করে এদেশের চাষ-আবাদ এবং ফলের বাগান এদের সাহায্যে নতুন রূপ লাভ করেছে। আনারস, পেয়ারা, আঁতা, লোনা, সপেট, কামরাঙ্গা, বিলাতী বেগুন, কাজু বাদাম, চীনেবাদাম প্রভৃতি অনেকগুলি দক্ষিণ আমেরিকার ফল, এরাই সম্ভবত এদেশে আনে। ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে "সান্ত রা" নামে এক প্রকার কমলালেবু পাওয়া যায়, -খুব সম্ভব পর্তুগালের অন্তঃপাতী সিত্রা নগরের নামে সাদৃশ্যেই এর নাম হয়েছে। পশ্চিম ভারতের "আলফন্সো" বা "আফুস" আম উৎকৃষ্ট বলে পরিচিত ছিলো। সাতগাঁ দাড়িম্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সম্ভবতঃ পর্তুগীজরাই এই প্রসিদ্ধির মূল কারন। এরা ফলের মোরব্বা, আচার ও নানা রকমের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করতে বিশেষ সিদ্ধ হস্ত ছিলো। পর্তুগীজরা সূর্যমুখী, রজণীগন্ধা, মুকুটফল, বিলিতি তুলসী, পীত কবরী, গাঁদা ইত্যাদি এদেশে এনে আমাদের ফুলের বাগানের শোভা বর্ধন এবং কপি, কড়াই শুটি প্রভৃতি তরিতরকারী চাষ করে আমাদের সব্জী বাগানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিল। সালসা আয়াপান, জোলাপ প্রভৃতি ঔষধের গাছ গাছরাও এরাই সম্ভবতঃ এদেশে নিয়ে আসে রোগীর পথ্য পাউরুটি আর বিস্কুট প্রস্তুত করা পর্তুগীজদের কাছ থেকেই আমরা শিখি। যে তামাকের ধুমপান করে করে এদেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী শ্রান্তি দূর করে এবং কি ধনী কি নির্ধন সকলেই আনন্দ লাভ করে। জাহাঙ্গীরের আমলে পর্তুগীজরাই তার প্রথম আমদানী করে এদেশে। একসময় পুরুষদের মধ্যে লবেদার এবং সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে ফিরিঙ্গী খোপার খুব প্রচলন ছিলো। দুইটিই পর্তুগীজদের দান। আলমারী কেদারা এবং যাত্রাদলের প্রাণস্বরূপ বেহালার পরিচয় পাই আমরা তাদেরই কাছে। সুত্তি ও নিলাম দ্বারা ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা এরাই এদেশে প্রবর্তন করে। "মাইরি" শব্দ মারীয়ার দিব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। পর্তুগীজরা কাকাতুয়া পাখী, কিরিজ, সগুদানা প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ মালয় দেশের কয়েকটি কথাও বাংলায় চলে এসেছে। এছাড়া বহু পর্তুগীজ শব্দ বাংলায় স্থান পেয়েছে, যেমনঃ-

আয়া - আলকাতরা- আলপিন- কপি - কাকাতুয়া- বোতাম
কাজুবাদাম - গামলা - গির্জা - চাবি - জানালা - মার্কা
বয়া - বালতি - বেহালা - নিলাম - পিপা - পিস্তল - সাগু
পেরু - পেরেক - কামরাঙ্গা - কিরিজ - কুপনখেলা - মায়া
তামাক - ফিতা - বরগা - বিস্কুট - বোতল - বোমা - মাস্তুল - সাবান - সালমা ইত্যাদি।

কবিতা

CELEBRATE CHRISTMAS & A HAPPY NEW YEAR

C- Christmas is a Day of joyous Celebration
E- Every Christian observes it without option,
L- Love Joy and Peace constitute this Day
E- Equip self with such, "I must always say."
B- Birth of Jesus is very special to all of you
R- Returning to Bethlehem, is already DUE,
A- Angels were there to adore the divine Baby
T- The Shepherds were invited to come & see.
E- Eagerness & humility led them to the spot
C- Christ was born to save & improve our Lot,
H- Honor this EVENT with heart, soul & mind
R- Reach an oppressed all around, you will find.
I- It is indeed a nobel ACT during this Season
S- Savior calls on everyone, as you march on,
T- Till Bethlehem cities & yours are reached
M- Meditate upon His Birth as message is preached.
A- Almighty Angles singing, `Glory to God in the highest.'
S- Share this message, my friend, at your best,
A- Around your friendly & distant neighborhood
N- Nation as a whole may not be in a loving mood.
D- Deviate not at all from its real Christmas Spirit
A- Announce it participants, thru a friendly treat,
H- Honoring the ushering of the year of 1999
A- As we humbly keep gazing al the HEAVEN.
P- Preparing for the Kingdom, the Lord's Army
P- Publishing such tidings as we move faithfully,
Y- Yielding self to the Master's divine guidance
N- Never, no never overlook life's real essence.
E- Everyday choose to resolve life's challenge
W- Waste no time to vainly seek earthly advantage,
Y- Year 1999 is going to be the most precious
E- Eradicating sin thru Cross to remain gracious.
A- All heavenly hosts are engaged ot help us thru
R- Remember, Colleagues to God, we must BE TRUE,

Pr. Nirmal Dewri, *North Carolina*

জীবনের ডাক

কেন ভেসে যাচ্ছিস স্রোতে-
খুব সাধারণভাবে, যেভাবে সবাই ভাসে।
কেন থেমে আছিস এই বদ্ধ ঘরে,
পড়ে আছিস খড়কুটোর মতো-
যেভাবে পড়ে থাকে- খুব সাধারণ আসবাবপত্র যতো।

কেন তুই বেঁচে আছিস? এই জীবনতরে,
আর মরে যাবি- আর পাঁচজন যেভাবে মরে।
ভুলে যাবে সবাই তোকে,
যেভাবে সবাই ভোলে - এই কোটি মানুষকে।
কি লাভ তোর এই বেঁচে থাকা?
যদি না রাঙাতে পারিস - নতুন স্বপ্নের খাতা।

জেগে ওঠো খোঁকা! জেগে ওঠো-
বাঁচার মতো বেঁচে - দূর্বার গতিতে চালা জীবন রথ।
ভেঙ্গে ফেল এই সনাতন বাঁধন - বদ্ধ গোড়ামী,
খুলে ফেল ঐ ভন্ডদের নকল মুখোশ - রুদ্ধ আড়ামী।
গুড়িয়ে দে ওদের মিথ্যা অহংকার-
আড়াল করে দে ওদের কালো টাকার ঝংকার।

ভেঙ্গে ফেল খোঁকা, ভেঙ্গে ফেল এই বেশ-
সমাজের যত ভেদাভেদ - সমাজের যত রেশারেশ।
দূর কর এই দলাদলি, মিথ্যা মারামারি।
অন্যায় কাড়াকাড়ি, স্বার্থের গল্পঝুড়ি।
সবাইকে এক করে দে,
ভালবেসে ভাতৃত্বের বন্যায় ভাসিয়ে দে।
সুন্দর এক পৃথিবী গড় খোঁকা-
হাসি-কান্নায় সবাই মিলে থাকবে যেথা।

জেগে ওঠো খোঁকা! জেগে ওঠো তোরা,
ভেঙ্গে ফেল ঐ ঢোরা- মিথ্যা পৃথিবীর তোঁড়া।
এভাবে যাসনে মরে, যেভাবে সবাই মরে-
বেঁচে থাক তোরা- সবুজ প্রাণের তরে।

- অপূর্ব জেরাল্ড গমেজ
ইউনিভার্সিটি অব্ সিডনী
ইকোনমিক এন্ড বিজনেস স্কুল।

ওগো বনফুল শিখাও মোদেরে

ও - ওগো বনফুল! শিখাও মোদেরে কেমনে ফুটে রব, এহেন ধরা মাঝে
গো - গোধূলি লগনে এনোই তুলে গোলাপ, যামিনী তাই সবাই সেজেছি নবসাজে,
ব - বনফুলের বাগিচায় মেতে উঠেছে, শত সহস্য রং বিরংএর ফুল
ন - নবীন আশা নিয়ে চলি মোরা ঐ মসজিদে, এতে যেন হয় না ভুল।
ফু - ফুলের বাগিচায় হঠাৎ যেন মোদের বাংলার রূপ সায়েরের ঢেউ লেগেছে
ল - লগ্ন বুঝে, চড়া চড়নী ঘড়ের আঙ্গীনায় বসে, গুন গুনিয়ে গান ধরেছে,
শি - শিউলী ফুলের মালা কেরামত করে গেঁথেছিলাম। তোমায় দিব বলে
খা - খান সাহেবের শুভাগমনে, সেই মালা না-নিয়ে, কেন তুমি গেলে চলে?
ও - ওরে মন! রমজানের ঐ রোজার শেষে, বাগিচায় নেমে এল, খুশীর ঈদ
মো - মোরা আজ জড়ো হয়েছি পাথর দিয়ে গড়িতে প্রেমেরি মসজিদ
দে - দেও গো! জাকাত উপস্থিত বন্ধু সুজন, দেও গো মন প্রাণে, জাকাত
রে - রেখনা কিছু পিছনে, জাকাত দেও এক্ষনে, এতেই খুলবে তোমার হাত!
কে - কে-ই বাজানে, কখন কার আসে ডাক্! ছেড়ে যেতে এই সাধের সংসার
ম - মসজিদে ঐ শোনরে আযান , "চল্ নামাজে চল্" এ সুযোগ হবে না আবার
ন - নতুন পথের যাত্রী মোরা সবাই এস সবে চালিয়ে যাই এই নব অভিযান
ক - কস্মিনকালেও যেন মোরা হৃদে না রাখি, কোন মান ও অভিমান।
রে- রে মন! হও শান্ত, হও ধীর, এগিয়ে চলো, আল্লাহ রাসূল বোল
ফু - ফুরিয়ে গেল দিনগুলি তোমার, এখন থেকে দুনিয়াদারী ভোল,
টে - টেকসই করো জীবনটি তোমার, কারন চরণ তলে ধূলি কান্দে মহম্মদ বলে
র - রহি বিশ্বস্ত সংসার মাঝে, ঐ দেখ নাচের তালে তালে, সোনার তাবিজ দোলে
ব - বনমাঝে নিরাশা আধারে, তুমি কেন হেথা দীপ হয়ে জ্বলো?
এ - এই গহন বনে গভীর রাতে, যদি ব্যাথা পাই, তাই বুঝি তুমি ফুল বিছাইয়া চলো
হে - হে মদিনার নাইয়া! ভবনদীর তুফান ভারী - জল্‌দী করো মোরে পাড়
ন - নয়নের কাজলে ছেঁপে উঠেছে তব নাম, তাই তোমাকে ডাকছি বারংবার।
ধ - ধর্মের পথে শহীদ হয়েছেন যাহারা - আমরা সেই যে জাতী
রা - রাত্রী শেষের যাত্রী মোরা, এসো মোরা এগিয়ে যাই লয়ে প্রেমের বাতী
মা - মাদল বাজিয়ে এলো বাদলা মেঘ, এলোমেলো করলো, মাতিল হাওয়া
ঝে - ঝেড়ে ফেলি পায়ের ধূলা, যেন খোদার সাথে প্রশমিত না হয় আসা যাওয়া।

এন, সি, দেউড়ী, ক্যালিফোর্নিয়া

রূপ এক স্বরূপে ভিন্নতা

হে নারী-
তোমার স্বরূপ অনেক
কখনো তুমি স্বেচ্ছাসেবী,
কখনো কোমলমতী কিশোরী।
কখনো বা স্নেহময়ী গর্ভধারিণী মা,
কখনো তুমি আদরিনী বোন।
কখনো তুমি সুষমা সৌন্দর্যে পূর্ণা স্বপ্নীল প্রেমিকা,
কখনো বা তুমি সিঁদুর পরিহিতা জীবন সঙ্গিনী ও।
আবার ছলনাময়ী ও হতে পার।
প্রেমাবেগে সব উজার করে নিতে পার
আবার অবজ্ঞায় ঠেলে দিতে পার ধ্বংসস্তুপে।
স্নেহের আকুলতায় বুকে আগলে নিতে পার
আবার বিমুখ হয়ে পার ফেরাতেও।
সেবায় লাঘব করতে পার দগ্ধ-যন্ত্রণা
অবহেলায় ঠেলে দিতে পার মৃত্যুর কোলে।
ঘরনী হয়ে ঘর আলো করতে পার
আবার কঠিনতায় ছেয়ে দিতে পার অন্ধকারে।
হে নারী-
তুমি পার অনেক কিছু
বিধাতার চরণে পূজার ডালি নিয়ে,
কর সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা।
এক বুক ধৈর্য্য নিয়ে নেভাও সংসারের আগুন।
হতাশার মাঝে আশার সনির্বন্ধতায়..,
দাঁড়াও পুরুষের পাশাপাশি।
আজ তাই প্রত্যাশা শুধু
ঘুমন্ত সত্ত্বাকে জাগাও এবার,
অশান্ত পিশাচীর ধ্বংস যজ্ঞ ভেঙ্গে দাও,
নির্মল প্রেমের মহানুভবতায়
ধরণীকে শান্তির পথ দেখাও।।

ভ্যালেন্তিনা অপর্ণা গমেজ, বারমুদা

emmanuel meaning
"god is with us"

It's Christmas day,
when there's many ways.
When you see Jesus in a manger lay
by the fresh smell of hay
when you may
hear the angels say -
Jesus, Our Christ is born!

christmas

I woke up on Christmas Eve.
I saw nothing but you and me.
I woke up on Christmas morn,
I saw Jesus in a manger born

- Stella Gomes (Priya)

সেই রাতের কথা

মনে আছে কি সেই রাতের কথা,
সন্তান হারা মায়ের ব্যাথা।
হঠাৎ থমকে গেল পৃথিবীর এক কোনা
ইতিহাসের পাতায় তাতো বোনা।
রাস্তায় নিরীহ মানুষের রক্ত,
মোদের করেছে ভয়ার্ত।
লাশে লাশে ভরা অলিগলি,
ঝরে পড়েছিল ফুলের কলি।
বুদ্ধিজীবীদের পরে থাকা লাশ,
তখনও চলেছিল শহরে ত্রাস।
হাজার মানুষের কান্না,
ওরা এনেছিল রক্তের বন্যা।
দাউ দাউ লেলিহান আগুন,
ভুলে গিয়েছিল সে বছরের ফাগুন।
বলত এবার স্বাধীনতার সারা,
কে দিয়েছিল এবং কারা?
কে করেছিল এ দেশ ধ্বংস,
যত্তসব নোংরার বংশ।
সে সব মনে আছে স্মৃতির পাতায়,
তাই লিখে রাখি মনের খাতায়

সান্ত্বনা

আজ আমি বড় একাকী,
আমার নেই কোন বন্ধু নেই কোন স্বজন,
সবাই মোরে করেছে পর।
চিন্তা করেছি আছেতো একজনি,
যে মোরে করেছেন সৃষ্টি,
আমার প্রতি তার রয়েছে দৃষ্টি,
তারই ইচ্ছায় আজ আমি দুঃখী,
আবার তারই ইচ্ছায় কাল আমি সুখী।
দুঃখের দিনে করি যে তার কাছে প্রার্থনা,
তিনি যে দুঃখেই মোরে দেন সান্ত্বনা।
আনন্দে তিনি কারও চোখে দেন কান্না,
করেন তব পাপীরে ঘেন্না।
এই পৃথিবীতে এসেছি তারই ইচ্ছায়,
এই পৃথিবী থেকে যাবও তারই ইশারায়।
তাই সুখ আর দুঃখে যতই আসুক কান্না,
তবুও আমি পাই যে তার কাছ থেকে সান্ত না।

প্রেমা ম্যাগডেলিন কস্তা
ঢাকা, বাংলাদেশ

ভাল লাগা

সোনালী সকালে সোনাঝড়া রোদে,
বিস্তীর্ণ মাঠ, ফসল ভরা পাকা ধান,
ঢেউ মেলানো সবুজ রঙে,
বন ময়ূরীর মত রাঙানো,
অবাক চোখে তাকানো,
পথ চলা পথিকের,
পায়ে চলা পথের বাঁকে-বাঁকে,
মেঠো সোদা গন্ধে ভরা,
বন বাগিচার ফাঁক দিয়ে,
যখন সূর্যের আলো ফিঙ্গে বুলবুলির মত,
এদিক ওদিক তির্যক ছায়া ফেলে,
তখন মনের ভিতর,
অন্য রকম ভাল লাগার মতই ভালো লাগে॥

গোধুলীর আভীর রঙ্গে রাঙানো,
চোখে তাকালে,
মনের ভিতরের,
কাঁচের উপর যেন ছায়া ফেলে,
যে ছায়া নিজের স্বত্তা ছাড়া বোঝা যায় না।
মনের গভীরের অন্তরের অন্তযামী
শুধু বোঝে যার অর্থ।

পাখীর ঘরে ফিরার মত,
গরুবাছুর নিয়ে রাখাল বালক,
সপ্ত ফোঁটা শিউলী ফুলের মৌ-মৌ গন্ধে
চারিদিক ভরপুর,
নাম না জানা পাখীর গান,
ঝি-ঝি পোকার একসাথে ডাক,
পূর্ণ থালার মত চাঁদ আকাশের গায়।

নদীর পানিতে নিজের ছায়া দেখে
ভাবতে ইচ্ছা হয়,
এইতো জীবন এর নাম বেঁচে থাকা।
জীবনের পূর্ণতার অর্থই ভাল লাগা॥

শিউলী গমেজ (পাচু)
নর্থ কেরালাইনা

Christmas is Here

Christmas is here
So be very good,
Santa's checking the
Whole neighborhood.
If you are bad
You better beware,
Santa is watching
You everywhere.
If you make
an ugly fist,
You will make
the naughty list.
Santa's coming
With his reindeer
And remember,
Christmas is here.

Catherina Gomes (Tithy)
Grade: 6, Raleigh, North Carolina

Art and Imagination

Art is fun
It's the best
From everything
It's better than the rest
Using crayons and markers too
It's the funniest thing, you could do
Colored pencils with pointed tops
Drawing many dancing mops
Oil pastels make things bright
So very good, use it right
Paint, paint, I'm splashing away
It's so much fun, may I stay?
Colors, there is so many to choose
Come on and try it, there is nothing you can loose
This is my poem all about art
When I create something new
it captures my heart
Now let's go out there and do something nice
Like drawing something wonderful
I mean didn't Chirst?

Suzan Gomes, Raleigh, NC
3rd grade

মোদের রাজা

ঐ শোন বাজে বাঁশী মধুর সুরে সুরে,
মোদের রাজা জন্মেছে আজ
ছোট গোশাল ঘরে।
গভীর রাতে খরের ঘরে
মায়ের কোলে আলো করে,
এলো রাজা মহা রাজা ধরণী উত্তলা করে।
তারই তরে রাখাল বালক
দূতেরে দেখলো চোখে
তিন পন্ডিতে খুজতে তারে বেরুলো এই রাতে।
স্বচ্ছ তারা আলো করে পথ দেখিয়ে দিল,
তিন পন্ডিত খুঁজে পেল মহান রাজাধীরাজরে।
গিয়ে দেখে মায়ের কোলে হাসে মোদের রাজা,
বাবা পাশে দাঁড়িয়ে আছে বসে যত প্রজা।
চারিদিকে প্রজার মেলা গরু, ছাগল, ভেড়া,
আলো করে আছে প্রভু ছোট গোশালা॥

রকি গমেজ (পাচু)
নর্থ কেরোলাইনা

এখনোও

এখনোও দুঃসময়
বিভীষিকাময় রাত, অতিক্রান্ত হয়নি এখনোও।
এখনোও সবরে সুন্দরতম
ফুল ফোটেনি উদ্যানে।
এখনোও দুরমের ডালি উজার হয়নি।
এখনোও পৃথিবীর সুন্দরতম
শিশুটি জন্মায়নি।
এখনোও অত্যাচারীর - অত্যাচার-
অবিচার শেষ হয়নি।
এখনোও মানুষগুলো সব-
পশুতে পরিণত হয়নি।
এখনোও মানবতা বিরাজমান,
একবিংশ শতাব্দীর ধ্বংসের পৃথিবীতে।
এখনোও আমার অসমাপ্ত,
কবিতাগুলো সমাপ্ত হয়নি।
এখনোও যে কথাগুলো,
বলতে চেয়েও আজোও বলা হয়নি
যে, তুমি - আমায় ভালোবাস।

আরনল্ড পি, কস্তা
ভার্জিনিয়া বিচ, ভার্জিনিয়া

হেরোদের আত্মা

হোরেদের আত্মা জীবিত
শিশু হত্যা চলছে এখনও।
হেরোদের আত্মা গর্ভে ভ্রুনোদ্দাম
জীবন্ত সন্তানদের হত্যা করছে;
নিস্পাপ ভ্রুণদের উপড়ে সুসভ্য মানুষের
পাশবিক অত্যাচার,
বৈজ্ঞানিক পন্থায় একটি নৃশংস হত্যাকান্ড।
প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ভ্রুণসন্তান হচ্ছে
গর্ভ হত্যার শিকার।
এ গর্ভপাতই জগতরে প্রথম হত্যাকারী
প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিম্বা যুদ্ধ নয়।
এই গর্ভহত্যার মাঝে দেখি
হেরোদের কুৎসিত আত্মার ভয়ঙ্কর হাসি।
বিলাসিত এই গর্ভহত্যার উদ্যোগী সেনা।
বিলাসিতার মোহে মানুষ হুশ্ হারিয়ে বেহুশ।
ঘাতকেরা ভ্রুণকে একটি মাংস পিন্ড বলে
হত্যা করে চলছে জীবন।
ভ্রুণ একটি প্রকৃত জীবন;
জীবন থেকে জীবনের উৎপত্তি।
ভ্রুণ পিতামাতার রক্তমাংসের,
প্রতিটি ভ্রুণ সন্তান।
মায়ের গর্ভে ভ্রুণ কেঁদে উঠে
গর্ভহত্যার যন্ত্রনায়।
আমি শুনি একটি ভ্রুণের চীৎকার-
'মা, আমাকে হত্যাকরনা
আমি জীবন, আমি মানুষ,
আমি তোমার সন্তান,
আমি তোমাকে ভালোবাসি মা,
আমাকে গর্ভে হত্যা করনা,
মা আমাকে বাঁচতে দাও
গর্ভপাত করোনা,
আমাকে হত্যা করোনা মা,
আমি তোমার ছেলে।'
হেরোদের আত্মা
শিশু হত্যায় মগ্ন।
গর্ভ হত্যা শিশু হত্যা,
গর্ভ হত্যা জীবন হত্যা,
হেরোরা শিশুহত্যার প্রথম নিষ্ঠুর নায়ক।

ওয়াল্টার বিশ্বাস
ওকল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া

সহভাগিতা

যখন তোমার শয়নের স্থান আছে ঠিক,
শীত নিবারনের গরম জামা আছে গায়,
খাদ্যের যখন নাই কোন অভাব,
চলার জন্য জুতা আছে পায়-
মনে রেখো তোমার মত ভাগ্যবান
অনেকেই কিন্তু নয়!
সেই দুর্ভাগাদের জন্য তুমি কি করেছো।
সেটাই হবে তোমার পরিচয়।
যখন তোমার রোজগারের স্থান আছে ঠিক,
জীবন ধারনের উপায় আছে বাঁধা,
জানার সুযোগের নাই কোন অভাব
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা দেশের শর্তে গাঁথা,
মনে রেখো তোমার মত সৌভাগ্যবান
সবাই কিন্তু নয়!
সেই অভাগাদের জন্য তুমি যা করেছো
সেটাই হবে তোমার জয়।

বেলী মেরী গমেজ
নর্থ কেরোলাইনা

সুবিবেচনা নির্বাসনে

হে জাতিসংঘ,
এগিয়ে আস ভ্রুণসন্তানদের রক্ষার্তে।
হে হোয়াইট হাউস,
গর্ভহত্যা বন্ধকর।
প্রতিটি ভ্রুণদের বাঁচার অধিকার আছে।
হে মানুষ,
"সুবিবেচনাকে ক্রয়কর"
ভ্রুণদের মুক্তিদাও
ভ্রুণেরা জীবন
তোমাদেরই মত জীবন।
হে হেরোদের আত্মাসকল,
পবিত্রাত্মায় বিশ্বাস কর।
হে বড়দিন,
কথাকও, কথাকও।

ওয়াল্টার বিশ্বাস

অপেক্ষায়

তাহার আশায় যায় যে কেটে কত রাত্রি সন্ধ্যা,
ঝরে যায় সাজিয়ে রাখা কত রজনীগন্ধ্যা,
তবু হয়না অভিশপ্ত কালের অবসান।
স্মৃতির তাড়নায় ভাঙে মন কেবল দিনমান।
অপেক্ষমান হৃদয় তপ্ত ক্ষরায় ফাটে,
যেমন নির্ঘুম অন্তহীন তিমিরেরা কাটে,
তাহারে করেছি মোর সর্বস্ব অর্পণ।
রচেছি স্বর্গ সুখের চিরন্তন স্বপন।
তবু তার বাস্তব, ক্ষণিকের আপন।
অতঃপর সঙ্গী শুধু বিচ্ছেদের বেদন।
অভিযোগ নেই মোর তবু অভিমান,
অশ্রুজলে যার সাক্ষ্য আজও বিদ্যমান।
যদিও মন মানে না অসম্ভবের বাধা।
রোধে না তারে কোন হারানোর ব্যাথা।
বুনে যায় স্বপ্ন স্মৃতির আঁচলে,
লিখে যায় কাব্য ভেজা কাজলে,
চির বাসনাতে নয়, চির কামনায়।
পুরাতন ভালবাসার, ভাঙা বেদনায়,
অবিচ্ছেদ্য দেয়ালঘেরা যাহার দূরত্ব
তবু তাতে পড়ে বাধা এ কেমন সত্য?
পারি না ছিঁড়তে লৌকিকতার বাঁধন
কঠিন বাস্তবের অলিখিত শাসন।
চূর্ণ হৃদয় গড়ে ক্ষোভের ইমারত
বেড়ে যায় অতৃপ্ত আত্মার ক্ষত।
তাও যার ভাবনায়, অপরিচিত যাচনায়,
কেটে যায় প্রহর গতিহীন অভিলাষে -
করি তারে অস্বীকার, আপনারে ভুলায়ে
কেবলই আটকে পড়ি আত্ম পরিহাসে।
এ কেমন সংসার? নিষ্ঠুর কারাগার,
নির্বাসিত অন্তর নাহি চায় আর,
কুলহীন, পারহীন ঢেউয়ের তোলপাড়।
আশায় বুক বাঁধি তাই জানাবার
কতকালে যাবে তরী সেই পারাপার?

জোন রোজারিও (দোলা)
উডব্রিজ, ভার্জিনিয়া

Winter

Brr! It's winter!
Makes me Shake!
Snow on the ground
And ice on the lake!
Look what's Falling!
Another snow Flake!
A big round snowman
Is what I'll make!
Some nice hot cocoa
Is what I'll take!
Don't even think about
Ice cream cake!
Brr! It's winter!
Give me a break!

Suzan Gomes
3rd grade, Raleigh,
North Carolina

আর্তনাদ

আমি এক দিক ভ্রান্ত যুবক-
সারাক্ষণ এক শূন্যতার অনুভব।
প্রতিটি সময় এক বিষন্নতার স্বাদ-
আমাকে পুড়িয়ে করছে ছারখার।
আমি কেমন যেন একা হয়ে যাচ্ছি-
আড্ডা আর খেলাধূলার ইচ্ছা হচ্ছে বাসি।
সবার সাথে শুধু ইচ্ছা প্রতিশোধের প্রতিভা,
সাহসের আর বীরত্বের।
আমি এক দিকভ্রান্ত যুবক।

রাস্তায় আমাকে কাঁদায়-
ঐ নিস্পাপ রোগাশীর্ণ ছেলেমেয়েগুলো,
আমাকে নির্ষ্কমার গালি দেয়-
ঐ অভূক্ত ভিক্ষুকগুলো।
আমাকে ধিক্কার দেয়-
ঐ নিপীড়িত মহিলাগুলো।
আমি এক দিকভ্রান্ত যুবক।

আমার স্বপ্নকে ভেঙ্গে দেয়-
দেশের সন্ত্রাসী বাজ শিক্ষাঙ্গন, আর-
দূষিত ঐ সমাজ।
আমাকে হতাশার সমুদ্রে ফেলে-
দুপুরের ঐ যানজট,
সভ্যতা আমাকে উপহাস করে-
দূর্নীতিযুক্ত কর্মক্ষেত্র আর-
ঐ স্বার্থ জড়িত রাজনীতি দেখে।

আমি এক দিক ভ্রান্ত যুবক,
আমি স্বান্তনার বাণী শুনতে চাই।
আমি এক দিকভ্রান্ত যুবক।
আমি এক দিকভ্রান্ত যুবক।

অপূর্ব জেরাল্ড গোমেজ
সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া

পন্ডিত মামা

আমাদের পন্ডিত মামা-
পরণে ঢিলাঢালা জামা।
তালের মত মাথা-
বুদ্ধিতে ঢাকা।
মুখটা গোল আলু-
চোখ দুটো নারিকেলের নাড়ু।
হাসলে দেখায় কাতলা মাছ।
দাঁতগুলো মাথা কাটা বাঁশ।
পেট যেন গোপাল ভাঁড়ের ভূড়ি-
হাত দুটো বইন্যা গাছের গুড়ি।
হাটলে দেখায় ভূয়া ব্যাঙ-
যদিও ভাব তার মাইকেল চ্যাং।
পা দুটো ইয়া মোটা-
যেন গাপ গাছের মোতা।
চুলগুলো কোঁকড়া
যেন, ঝুনো নারিকেলের ছোবড়া।
গলার স্বর দাড় কাক-
মাঝে মাঝে দেয়, পেতি শিয়ালের ডাক।
গাল দুটো মাটির তবলা-
মনে হয় বাজাই- 'ধা ধিন ধা'।
ভ্রু দুটি ছাগলের লেজ-
শ্রবণ শক্তিতে কিন্তু আছে তেজ।
কান দুটি সানাই বাঁশি-
যেন নাইলনের পাকানো রশি,
বড় বড় চ্যাপটা - একটু বাড়া
খরগোশের মত খাড়া।

সেই আমাদের পন্ডিত মামা-
সবজান্তা শমসের - নির্ষ্কমা -
গপপের কাঁঠাল ছোবড়া ভরা।

অনন্ত গমেজ
গোল্লা মিশন, ঢাকা

কেউ ভিসা দেয়নি

কেউ ভিসা দেয়নি
তেত্রিশ মাস কাটলো
কেউ আমাদের ভিসা দেয়নি।
আদম ব্যাপারী মদন মিয়া বলেছিলো-
টাকা দিন, আপনাদের আমরা বিদেশ পাঠাবো
হালের গরু, ধানী জমি বিক্রি করে
টাকা দিয়েছিলাম মদন মিয়াকে।
তারপর কত লোক বিদেশ গেলো
কত লোক ফিরেও এলো
কিন্তু আমরা বিদেশ যেতে পারিনি
সাত মাস প্রতীক্ষায় আছি।
বিগলিত হাসি হেসে মদন মিয়া বলেছিলো
অপেক্ষা করুন কেনেট, প্রেমু, রবিন সাহেব
আপনাদের আমরা ডলার,
রিয়ালের দেশে পাঠাবো
এখনতো আগের সিরিয়ালের
লোকদের-পাঠানো হচ্ছে।
মদন মিয়া আমরা আর কত অপেক্ষা করবো
আমাদের পরিবার না খেয়ে মারা গেলে
তবেই কি-আপনি আমাদের বিদেশ পাঠাবেন?
একটা ভিসা বাগাতে পারিনি আজো।
অথচ বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে করে
বিদেশ গেছে কত নতুন লোকেরা
তেত্রিশ মাস কাটলো কেউ ভিসা দেয়নি।

(কবিতাটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "কেউ কথা রাখেনি" কবিতা অবলম্বনে)।

কেনেট ফ্রান্সিস রোজারিও
তেজগাঁও, ঢাকা

Christmas Poem

What do you do
during Christmas time?
Do you put up chimes?
Or do you listen for rhymes?

On Christmas Eve Santa swings by
But you never say hi.
Gee; I wonder why!

Are you sleeping?
Are you moping?
Are you enjoying, your Christmas?

During Christmas you get a lot of gifts.
And you hear a lot of myths.

We put up Christmas trees
That do not contain any bees.

During Christmas we get a freeze,
That eventually gives us a sneeze.

Christmas time is near
So, it's almost time to hear
Merry Christmas and a Happy New Year!

Tony Rozario, *Woodside, NY*

COMPARE

Your sisters all must stay at home,
your brothers are sent away.
Just we three together, my little children,
shall chat as we go along.
Each day they have meals before us,
at night we sleep all together.
We have lamps and tapers to peer in the dark,
and warm clothes for the cold.
In past years you saw how the Counselor's son
fell out of favor in the capital;
now people say he's a ragged gambler,
and call him names on the street.
You've seen barefoot wandering musician
the townspeople call the Justice's Miss,
her father, too, was a great official;
they were all in their day exceedingly rich.
Once their gold was like sand in the sea;
now they have barely enough to eat.
When you look, my children, at other people,
you can see how kind Heaven has been!!!

Joy T. Rozario, *Woodside, NY*

A Princess

Once upon a time there lived a princes.
She lived in a palace
but she didn't have any money.
She was very, very sad
she cried all day.
People tried to cheer her up
but she didn't.
So, her mom and dad went to buy her stuff
and they had a surprise party for her
and she opened her presents
and she was so happy
she thanked every one
she was surprised and she didn't cry no more
she had big smile!!!

Emma Parna Gomes
(7 years old)
Garner, North Carolina

ইউনাইটেড বাঙ্গালী লুথারেন চার্চ অব আমেরিকার তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

বিগত ১৯ অক্টোবর ২০০৩ এ অত্র চার্চের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চার্চ স্থাপিত হয়েছে ১৫ই অক্টোবর ২০০০ খ্রীঃ। এবারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী মূলত ২টি কারণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ বিগত ৭ই জুন ২০০৩ আটলান্টিক ডিষ্ট্রিক্ট তাদের ত্রি-বার্ষিক কনভেনশন অত্র চার্চকে মিসৌরী সিনেডের অন্তর্ভুক্ত অত্র ডিষ্ট্রিক্টের একটি সার্বভৌম এবং অন্যান্য ইংলিশ চার্চের সম-মর্যাদা সম্পন্ন। একটি চার্চ হিসেবে অফিসিয়াল স্বীকৃতি দান করে। দ্বিতীয়তঃ কিছু সংখ্যক নিবেদিত প্রাণ খ্রীষ্ট ভক্তের আগমন যারা প্রভুর বাক্য প্রচারে

পাষ্টরবৃন্দ (ডান থেকে)ঃ ডেভিড জে বর্ণ, ভিপি সলটাইস, ডঃ রেভাঃ ডি এইচ ব্যাংকী (প্রধান অতিথি), রুডলফ ব্রুস, জেসি জ্যাকশন, হুগো বার্গার, জেমস এস রয়।

খুবই উৎসাহ দেখিয়ে থাকেন এবং অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল মধ্যাহ্ন ভোজন ও কেক কাটা, পবিত্র উপাসনা ও কালচারাল ফাংশান। প্রধান অতিথি ডঃ ডি, এইচ ব্যাংকী সহ কয়েকজন পাস্টর ও মিশনারী কেক কেটে অনুষ্ঠানমালা শুরু করেন।
এরপর মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ হলে সবাই চার্চের ভিতর আসন গ্রহণ করেন। এ সময় উপস্থিত সব গণ্যমান্যদের অভ্যর্থনা জানানো হয় অত্র চার্চের মিউজিক ডাইরেক্টর মিস জুলিয়ানী রত্নের (মঙ্গলদ্বীপ জ্বালিয়ে) রবীন্দ্রনাথ রচিত 'আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর' গানটি একক নৃত্যের মাধ্যমে।
অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের পর পবিত্র উপাসনা শুরু হয় রেভারেন্ড জেমস এস রয়ের পরিচালনায়। উক্ত উপাসনায় পাষ্টর ডেভিড জে বর্ণ, পাষ্টর ভিপি সলটাইস ও পাষ্টর রুডলফ ব্রুস প্রভুর বাক্য প্রচার করেন। তাঁরা সকলেই পবিত্র বাইবেলের আলোকে একটি সত্যের উপর আলোকপাত করেন তা হলো যে, একটি চার্চের অনেক দায়-দায়িত্বের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল সু-সমাচার প্রচার করা। এবং একটি মন্ডলী আরো অনেক মন্ডলীর জন্ম দিবে। উপস্থিত সুধী মন্ডলীর মধ্যে মিসেস রানী ডায়াস নিজ জীবনের অসুস্থ্যতা ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্তির সাক্ষ্য দিয়ে উপস্থিত সকলকে মোহিত করেন এবং তিনি স্বীকার করেন ও ধন্যবাদ দেন এই বলে যে, 'ইউনাইটেড বাঙ্গালী লুথারেন চার্চ' বিশ্বস্তভাবে তার জন্য প্রার্থনা করেছে।
অত্র চার্চের সহকারী পালক মি এলিও বৈরাগী প্রার্থনা সহ অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করেন। উপস্থিত সমস্ত খ্রীষ্ট ভক্ত ও সুধীবৃন্দকে অভ্যর্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রেসিডেন্ট মি. জন এস বাড়ৈ। নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন আটলান্টিক ডিষ্ট্রিক্ট এর নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ইংলিশ স্পিকিং চার্চের সদস্য ও পাস্টরবৃন্দ, প্রবাসী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও তার পরিবারসহ অন্যান্য অফিসার ও নেতৃবৃন্দ। ইএসএল এর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, অন্যান্য শুভাকাঙ্খী হিন্দু ও মুসলিম ভাইবোনেরা এবং গোপলগঞ্জ সমিতির সভাপতি ও তার পরিবারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
পবিত্র উপাসনা শেষ হবার পর প্রেসিডেন্ট মি. জন এস বাড়ৈ'র নেতৃত্বে শুরু হয় কালচারাল ফ্যাংশন। উক্ত অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে উঠে মি. মোসেস পাটোয়ারী ও তার মেয়ে এথেনা, মুক্তি, মাধবী, পলি, শান্তা, প্রাপ্তি, মি. টমাস রয় ও আরো অনেকে।
মি. টমাস রয়কে ধন্যবাদ দেই কারণ তিনি আমাদের এই অনুষ্ঠান কৃতকার্য করার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। পাকিস্তানী গায়ক পাষ্টর সেমি শ্যামশনকেও ধন্যবাদ দেই সুন্দর একটি গান পরিবেশন করার জন্য।
চার্চের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কৃতকার্য করার জন্য যারা আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন যেমন প্রেসিডেন্ট, সহকারী পরিচালক, সেক্রেটারী, পাষ্টর অন্যান্য চার্চ নেতৃবৃন্দ, অতিথি ও চার্চের শিল্পীবৃন্দ, চার্চের সদস্যবৃন্দ, তাদের সকলকে এবং যে সমস্ত অতিথিবৃন্দ সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করেছেন তাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

- প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

যাদেরকে হারিয়েছি

নামঃ ভেরোনিকা গমেজ
স্বামীঃ গ্যাব্রিয়েল কস্তা
জন্মস্থানঃ সাভার
সন্তানঃ ১১ জন
বড় ছেলে সুবল কস্তা ও তার পরিবার নিউইয়র্কে বসবাসরত।

নামঃ রাফায়েল গমেজ
জন্মঃ ১৪ এপ্রিল, ১৯২৯
পরলোক গমনঃ ১২ মার্চ, ২০০৩
নিউইয়র্ক।

নামঃ কমলা লিলিয়ান গমেজ
জন্মঃ ২১ এপ্রিল, ১৯৪৬
পরলোক গমনঃ ১ জানুয়ারী, ২০০৩
নিউইয়র্ক।

যাদেরকে পেয়েছি

নামঃ ব্রায়ান ইভান্স গমেজ
জন্মঃ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৩
পিতাঃ উইলিয়াম গমেজ (পলাশ)
মাতাঃ সুজান ডি'ক্রুজ (অপর্ণা)
কুইন্স, নিউইয়র্ক।

নামঃ এ্যাঞ্জেলা নিকোল গমেজ
জন্মঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩
পিতাঃ শ্যামল গমেজ
মাতাঃ অপর্ণা গমেজ
নরউইচ, কানেকটিকাট

নামঃ এলিসা স্নিগ্ধা রোজারিও
জন্মঃ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৩
পিতাঃ যোসেফ অসিম
মাতাঃ ফ্লোরেন্স পিয়াসী রোজারিও
বেয়ন, নিউজার্সি।

নামঃ এলিজাবেথ এশলি ডেসাই
জন্মঃ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৩
পিতাঃ মাইকেল রোজারিও
মাতাঃ এলিজাবেথ রোজারিও
এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক।

নামঃ যোসেফ অর্ঘ গোমেজ

পিতাঃ আলেক্জান্ডার গমেজ

নামঃ ইভান অনুজ পিউরিফিকেশন
জন্মঃ ১৬ নভেম্বর, ২০০৩
পিতাঃ প্রশান্ত পিউরিফিকেশন
মাতাঃ শিউলি পিউরিফিকেশন
জার্সি সিটি, নিউজার্সি।

নামঃ এরিয়ানা ই. গনছালভেস
জন্মঃ ৪ অক্টোবর, ২০০৩
পিতাঃ জোনাস গনছালভেস
মাতাঃ সুজান গনছালভেস
কুইন্স, নিউইয়র্ক।

নামঃ অষ্টিন উইলিয়াম রোজারিও
জন্মঃ ১১ অক্টোবর, ২০০৩
পিতাঃ জর্জ রোজারিও (অসিম)
মাতাঃ নাতাশা রোজারিও
উডসাইড, নিউইয়র্ক।

নামঃ লরেন্স ধ্রুব রোজারিও
জন্মঃ নভেম্বর ৩০, ২০০৩
পিতাঃ রনি রোজারিও
মাতাঃ শিখা রোজারিও
রিচমন্ড হিল, নিউইয়র্ক।

নামঃ এলিশা গমেজ
জন্মঃ
মার্চ ১৫, ২০০৩
পিতাঃ
রুবেন রড্রিক্স
মাতাঃ
এলিস রড্রিক্স
লেভিটটাউন,
নিউইয়র্ক।

নামঃ ক্রিশান টাইলর গমেজ
জন্মঃ
আগষ্ট ৮, ২০০৩
পিতাঃ
পল গমেজ
মাতাঃ
হেমা গমেজ
হিক্সভিল,
নিউইয়র্ক।

WE Wish All
A Very Happy Christmas
And
A Happy New Year 2004

Anthony B Gomes
Shela M. Gomes
Brigit M. Gomes
Denis M. P. Gomes
Elmhurst, New York

নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্কলারশিপ লাভ

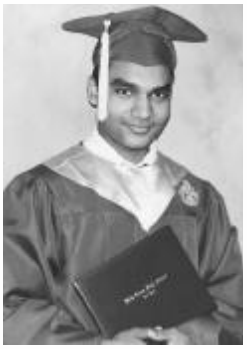

নিউইয়র্কে বাঙালী সমাজের এক মেধাবী ছাত্র ডেনিস মেগডিলিন ফিলিপ গমেজ (ডাক নাম সুমিত) ইন্ডিয়ানার নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্কলারশিপ পেয়ে সেখানে ২০০৩ সনের আগস্ট মাস থেকে শুরু করে আগামী বৎসর Bechelor of Science in Mechanical and Aerospace Engineering বিষয় নিয়ে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছে বলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। নিউইয়র্কের ফ্লাশিং-এ অবস্থিত হলিক্রশ ব্রাদারদের দ্বারা পরিচালিত 'হলিক্রশ হাইস্কুল' থেকে গত মে মাসের ৩১ তারিখে সে হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। দ্বাদশ গ্রেডে ১৮৯ জন ছাত্রের মধ্যে সে ছিল তৃতীয় স্থানের অধিকারী। তার জিপিএ ছিল ৪.০০৮ এবং গড় নম্বর পেয়েছে ৯৭%। সুমিতের এই সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে President's Award For Outstanding Academic Excellence, Queens County Savings Bank এর Quality Student Award, New York Community Bank এর Gift Certificate এবং স্কুল থেকে Outstanding Scholastic Excellence Certificate প্রদান করা হয়। সুমিতের বংশ পরিচয় সে হাসনাবাদ ধর্ম পল্লীর ইকরাশী গ্রামের ডাক্তার বাড়ির সন্তান। তার ঠাকুরদাদা ফিলিপ গমেজ (মৃত) ও ঠাকুরমা মেগডিলিন গমেজ (মৃত) এবং দাদু মোয়াকিম দেশাই (মৃত) ও দিদিমা আন্না দেশাই। ওর জন্য প্রর্থনার অনুরোধ রইল। প্রভুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রবাসের দিনগুলো

রংধনু - বছরের শুরুতে শুভেচ্ছা সফরে প্রখ্যাত গায়ক এন্ড কিশোর নিউইয়র্কে এসে প্রবাসী বন্ধুদের সাথে মিলিত হন

এক পলকে একটু দেখা - প্রবাসী এপ্রিসিয়েশন ডে -এর অনুষ্ঠানে বা দিক থেকে মিসেস ডরথী রোজারিও, মিসেস মেবেল কুইয়া গমেজ ও মিঃ রোনাল্ড কুইয়া

ওরা ২১ জন - প্রবাসী এপ্রিসিয়েশন ডে অনুষ্ঠান 'অংশগ্রহনকারী মা-বোন-মাসীরা, সাথে YOUNG অমিতাভ

বনভোজন - ২০০৩

বনভোজন - ২০০৩

বনভোজন - ২০০৩ - কসরত - শ্রীমান জীবন গমেজ, শ্রীমান মেবার্ট ফার্ণানডাজ। বসে গল্প করছেন শ্রীমান উইলিয়াম গমেজ ও শ্রীমতী উইলিয়াম গমেজ

বনভোজন - ২০০৩ - বিজয়ীর বেশে শ্রীমান জেমস গমেজ আদি, পাশে জল পিপাসু ফিলিথ গমেজ

প্রবাসের দিনগুলো

আশির্বাদ- প্রবাসী ঃ বাঁ দিক থেকে সাইমন গমেজ, সেবাষ্টিন গমেজ, সেবাস্টিন পংকজ রোজারিও , পলাশ গমেজ, প্যাট্রিক রোজারিও, ফাদার ডেলী, বিশপ যোসেফ সুরেন গোমেজ, ফাদার ষ্ট্যানলী, প্রভা গনজাবেস্, যোসেফ ডি কস্তা, নমিতা কস্তা ও লিটন এ্যামিলি

দৃষ্টির সীমানায় - বিশপ মাইকেল ডি. রোজারিও'র সাথে মিলিত হচ্ছেন বাঁ দিক থেকে মিঃ জন রোজারিও, মিঃ অনিল রোজারিও, মিঃ সিরিল রোজারিও, পেছনে মিঃ ফ্লেবিয়ান কুইয়া।

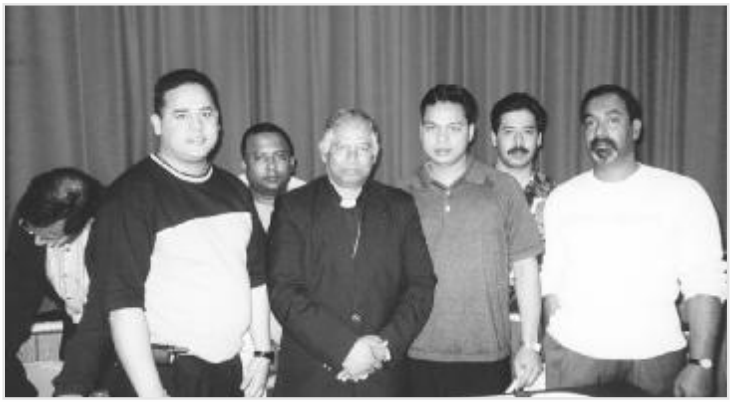

কিছুক্ষণ- বিশপ যোসেফ সুরেন গমেজ, সাথে বাঁদিক থেকে রাজিব গমেজ, তাপস গমেজ, শ্যামল গমেজ ও অতুল রডিকস

মোহনা - মিঃ ব্লিন গনছালভেস ও বিশপ মাইকেল ডি. রোজারিও'র

দেখা - বা দিক থেকে মিঃ যোসেফ দাস, ফাদার স্ট্যানলী, বিশপ মাইকেল ডি. রোজারিও'র ও মিঃ রবার্ট গমেজ আদি

আপন ভুবন - ১ম খ্রীষ্টান সম্মেলনে মিঃ জন এফ কুইয়া সামান্য জল গ্রহণ করছেন, যখন মিঃ প্রেমানন্দ হাঁজরা কিছু বলছেন।

কেউবা পেয়ে সুখী - কেউবা দেখে সুখী - সম্মেলনে লটারী বিজয়ী মিসেস শোভা রোজারিও, পাশে দন্ডায়মান মিঃ স্বপন রোজারিও ও মিঃ সিরিল রোজারিও।

সম্মেলনে নৃত্যরত প্রতিযোগী

ধীরে বহে মেঘনা - সম্মেলনে শত আনন্দ ফল্গুধারার মাঝেও সামান্য একটু পারিবারিক সময় বের করে নিয়েছেন মিঃ মোজেস পাটোয়ারী।

এন্ড্রু কিশোরের সাথে প্রবাসীর প্রতিনিধিবৃন্দ

সম্মেলনে প্রতিযোগীদের একজন

Attention Please - বাঁ দিক থেকে সম্মেলনের মঞ্চ পরিচালক মিঃ ক্লেমেন্ট বাদল রোজারিও, ধাঁধাঁ পরিচালক - ডেনিস রোজারিও।

যে ছিল দৃষ্টির সীমানায় - সম্মেলনে কর্মরত মিঃ টমাস গমেজ, পাশে দাড়িয়ে ছবি তুলছেন মিঃ এ্যান্থনী গমেজ।

প্রবাসের দিনগুলো

নমস্কার - সম্মেলন ২০০৩

শেষ পর্যন্ত - সম্মেলনে সামান্য একটু বিরতী নিচ্ছেন আগত অতিথিরা।

আনন্দ প্রবাহ - সম্মেলনে আগত অতিথিরা।

শুভাগমন - সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দ।

ব্যাখ্যা - বাঁ দিক থেকে মিঃ মিঃ পল বালা, ও মিঃ এন্ড্রু কিশোর।

বিজয় ধারা - সম্মেলনে লটারী বিজয়ী মিঃ আন্তনী গমেজ, সাথে তার কন্যা। ডানে মিঃ টমাস দুলু রয় ও সর্ববামে মিসেস হেলেন রয়।

নূতন পৃথিবী - সম্মেলনে অনুষ্ঠানরত ওয়াশিংটনের শিল্পীরা।

প্রবাসের দিনগুলো

সিঞ্জন - সম্মেলনে অনুষ্ঠানরত ওয়াশিংটনের শিল্পীরা।

প্রলয় - প্রবাসীর হ্যালুইন পার্টিতে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ।

ধ্রুবতারা - মারীয়া সেনা সংঘের সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দ।

মারীয়া সেনা সংঘের সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দ।

মারীয়া সেনা সংঘের সম্মেলনে নতজানু অবস্থায় ফাদার ষ্ট্যানলী, বিশপ ও স্থানীয় পুরোহিত।

প্রবাসের দিনগুলো

পলাশীর প্রান্তর - নিউজার্সির জার্সি সিটিতে বাংলা খ্রীষ্টযাগ শেষে আনন্দ মিলনে উপস্থিত খ্রীষ্টভক্তদের একাংশ।

বহুরূপ - প্রবাসী হ্যালুইন হাঙ্গামা পার্টি

বর্ণচোরা - প্রবাসী হ্যালুইন হাঙ্গামা।

প্রবাসের দিনগুলো

Probashi Nuts - খ্রীষ্টিনা, প্রিয়া, রিনি ও

যদি কিছু মনে না করেন - প্রবাসী হ্যালুইন হাঙ্গামা পার্টি।

সূর্যগ্রহণ - প্রবাসী এসোসিয়েশন ডে-তে সামান্য জলগ্রহণ করছেন শ্রীমান বেঞ্জামিন রোজারিও ও শ্রীমান জোসেফ পি দাস

আবির্ভাব - প্রবাসী হ্যালুইন হাঙ্গামা পার্টিতে লাবন্য ও মিসেস মুকুলী গমেজ।

আজ তবে এইটুকু থাক - প্রবাসী হ্যালুইন হাঙ্গামা পার্টিতে মিঃ এ্যান্থনী ডি কস্থা (সুভাস), মিসেস ও ছোট্ট বন্ধুরা

মরু তীর্থ হিং লাজ - প্রবাসী এপ্রিসিয়েশন ডে-তে মিঃ সুবীর রোজারিও, মিঃ কিশোর গমেজ ও মিঃ রেমন্ড রোজারিও

মা ও মেয়ে - প্রবাসী হ্যালুইন হাঙ্গামা পার্টিতে।

আসন্ন বাংলাদেশ সফরের পূর্বে কংগ্রেসম্যান যোসেফ ক্রাউলীর সাথে প্রবাসীর প্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রবাসের দিনগুলো

কির্তন ২০০৩

বাঁশী কই আগের মত বাজে না - প্রবাসী হ্যালুইন হাঙ্গামা।

সদানন্দের মেলা - খ্রীষ্টান সম্মেলনে (বাঁ থেকে) - মিঃ ও মিসেস এস.কে. দাস, ফাদার ভেলী, ফাদার ষ্ট্যানলী, কনসাল জেনারেল মিঃ রফিক আহমেদ ও তার স্ত্রী।

প্রবাসের দিনগুলো

প্রিয় বান্ধবী ঃ কানেকটিকাটে প্রবাসী বন্ধুরা

ঝড়ের পাখী ঃ তুষার ঝড়ের মাঝে কির্তনরত প্রবাসী কির্তন দল - ২০০৩

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ খ্রীষ্টযাগ পর্ব

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ খ্রীষ্টযাগ পর্বে খ্রীষ্ট প্রসাদ গ্রহণরত খ্রীষ্টভক্ত গণ।

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ প্রবাসী কির্তন দলের গান

প্রবাসের দিনগুলো

প্রবাসী জেনারেলগণ ঃ বাঁ দিক থেকে সাইরাস, প্যাট্রিক, রিচার্ড, পঙ্কজ, পল এবং বিকাশ

উপহার ঃ পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় নির্মল গমেজ ও দিপ্তী গমেজ

আনন্দ প্রবাহ ঃ নৃত্যরত শিউলী ও সিলভিয়া

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ আনন্দ প্রবাহ

আনন্দ প্রবাহ ঃ জন মালো, ফাদার লেনার্ড রোজারিও ও মিঃ মাইকেল মালো

চেনা চেনা লাগে ঃ আনন্দ প্রবাহে দর্শকদের একাংশ

নূতন পৃথিবী ঃ আনন্দ মিলনে একদল তরুণ

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ কোথায় যেন দেখেছি

প্রবাসের দিনগুলো

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ একই অঙ্গে এত রূপ

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ আমি সে ও সখা

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ তীর ভাঙ্গা ঢেউ

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ পৃথিবীর শেষ রেল ষ্টেশন

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ সঙ্গীতরত জেসান হালদার

তুমি আরেকবার আসিয়া, যাও মোরে কান্দাইয়া ঃ আনন্দ প্রবাহে রথীন্দ্রনাথ রায়ের শেষ উপহার

সেবাই ধর্ম

সেবাই কর্ম

প্রবাসের দিনগুলো

স্যান্তা ও তার বাহিনী

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ আগত অতিথিবৃন্দ

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ বেদে-বেদেনীর নৃত্যে দিপ ও ভিক্টোরিয়া

Few Good Fellows ঃ প্রবাসীর কর্মীবৃন্দ

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ রথীন্দ্রনাথের সাথে মিঃ ও মিসেস রয়

মোরা আর জনমে হংস মিথুন ছিলাম...

প্রবাসী বড়দিন পূনর্মিলনী ঃ ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই ছোট সে তরী, আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরী - প্রবাসী।